

কুমুদিনী

কুমুদিনী

বুদ্ধদেব গুহ

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

KUMUDINI
a novel by Buddhadev Guha

Published by
SAHITYAM
18B, S.C. Dey Street,
Kolkata-700 073

প্রথম প্রকাশ :
২৩ জানুআরি ১৯৬০

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সি
৮৯, মহাত্মা গান্ধি রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৭

বর্ণ-বিন্যাস :
কম্প-অ্যাক্ট
সি জি-৮০, সল্ট লেক,
কলকাতা-৭০০ ০৯১

মুদ্রক :
লোকনাথ প্রিন্টিং অ্যান্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস
২৪বি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : অনিকেত রায়

উৎসর্গ

আমার কুমুদিনীকে—



১

—তুমি এখন কোথায়?

—বাড়িতে।

—সবে অফিস থেকে ফিরেছি। এখন আরাম করে এক কাপ চা খাচ্ছি তারিয়ে তারিয়ে। তারপর চানে যাব।

—তুমি কি বাথটাবে চান করো? না শাওয়ারে?

—বাথটাব কোথায় পাব? আমি শাওয়ারেই চান করি। কখনও কখনও কলের নীচে বালতি পেতে তাতে জল ভরেও চান করি।

—জলে কি আতর মেশাও?

—না। আমি কি বাদশাজাদী? আমি অতি নগণ্যজন।

—মাটিতে বসে চান করো?

—না। কাঠের জলচৌকি আছে। তাতে বসে করি। তাড়া থাকলে অবশ্য শাওয়ারেই করি।

—আর তাড়া না থাকলে?

—জলচৌকিতে বসে আরাম করে সময় নিয়ে সাবান মাখি, শ্যাম্পু করি, তারপর অনেকক্ষণ ধরে চান করি।

—ঈসস্। ভাবতেও গা শিউরে উঠছে। তোমার চানঘর তখন তোমার গায়ের গন্ধে নিশ্চয়ই ম ম করে।

—অত জানি না।

—কখনও ঝর্নাতলার নির্জনে চান করেছ? বনের মধ্যে, পাখির ডাকের মধ্যে, ঝর্নার বহতা জলের শব্দের মধ্যে?

—আপনি নিয়ে গেলেন কোথায় জঙ্গলে? আপনার মতো পাহারাদার সঙ্গে না নিয়ে কি অমন করে চান করা যায়? এ দেশের মেয়েরা এখনও অনেক ব্যাপারেই পরাধীন। তাদের পক্ষে এখনও অনেক কিছুই করা সম্ভব নয়। ইয়োরোপ বা আমেরিকা-কানাডার মেয়েরা একা একা জঙ্গলে গিয়ে ট্রেকিং করে, তাঁবু খাটিয়ে থাকে, তা কি আমরা পারি? আমাদের যে অনেকই বিপদ।

—পাহারাদারই যদি চোর হয়?

—তবে তা আরও বিপদের কথা।

—বিপদ তো আছে অবশ্যই। আমি না হয় বিবসনা স্নানরতা তোমাকে পাহারা দিলাম, কিন্তু আমার লোভকে পাহারা দেবে কে? যে লোভকে বাইরে থেকে দেখা যায় না, সে যে পাহারাদারের বুকের মধ্যেই বাস করে এবং কোন কুমুহূর্তে যে সে বাইরে বেরোতে চাইবে তা কি পাহারাদার নিজেই জানে?

—কথায়ও আপনার সঙ্গে পারব না।

—না, এখন কথা বলার সময়ও নয়। তুমি ক্লান্ত হয়ে ফিরেছ। যাও, এবার চা খেয়ে চানে যাও।

তারপর ডাহুক বলল, দুপুরে কি মোবাইল অফ্ করে রেখেছিলে?

—হ্যাঁ? সাইটে গেছিলাম তো।

—কোথায়?

—চন্দননগরে। সেখানে নতুন মাল্টিপ্লেক্স।

—বাঃ। দিনে দিনে আর্কিটেক্ট হিসেবে তোমার বিশ্বজোড়া খ্যাতি হোক এই প্রার্থনা করছি। এবারে ছাড়ো।

—না। ছাড়ব না। আপনি ছাড়ুন।

—আহা! কী ভালোই শোনাল কথাটা। তুমি আমাকে ছাড়বে না। কথাটা যদি জীবনে সত্যি হতো।

তারপরে ডাহুক বলল, ছাড়ছি। শুধু একটা কথা বলো।

—কী কথা?

—তোমার চানঘরে টিকটিকি আছে?

—হঠাৎ?

—আছে কি না বলো?

—লক্ষ্য করিনি। থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু কেন ও কথা?

—যদি থেকে থাকে তাহলে নিরাবরণ হয়ে চান করার সময় মনে রেখো যে আমিই সেই টিকটিকি। তোমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছি।

—সত্যি! আপনি ইন্‌করিজিবল্। আপনার কত বয়স হল বলুন তো?

—শরীরের বয়স যাইই হোক। মনের বয়স সতেরো। আমার শরীর যতই বুড়ো হচ্ছে মন ততই তরুণ হচ্ছে। এটা কি একটা রোগ?

—রোগ কি না জানি না। তবে দিনে দিনে যে একটি 'ইয়ে' হয়ে উঠছেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

—আহা! অমন করে বোলো না কুমু। আ ম্যান ইজ অ্যাজ ইয়াং অ্যাজ হি ফিলস অ্যান্ড আ ওম্যান ইজ অ্যাজ ইয়াং অ্যাজ শি লুকস। প্রাণে কি এমন করে আঘাত দিতে আছে? তোমাকে আমার এই সুগন্ধি হৃদয় কবেই দিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু....

—কিন্তু কী?

—তুমি যে এখনও তরুণী আছ। বাচ্চা মেয়ে।

> "আভি কামলিন হো, কাঁহি খো দেওগি দিল মেরা
> তুমহারি লিয়েই রাখ্‌খা হ্যায় লে লেনা জোঁয়া হো কর"

—মানে?

—মানে হল, তুমি যে এখনও ছোট্ট আছ, এখন দিলে কোথায় হারিয়ে ফেলবে আমার এ হৃদয়। তোমার জন্যেই রাখা আছে, বড়ো হবার পর নিয়ে নিও।



২

—তুমি কোথায়?

ডাহুক বলল, কুমুদিনী মোবাইলে এলে।

—আমি শান্তিনিকেতনে।

—কবে গেলে?

—গতকাল এসেছি।

—থাকবে ক'দিন?

—তিনদিন।

—আমি পৌঁছে যাব?

—একদম না।

—আমার তো ওঠার জায়গার অভাব নেই। আমার নিজের তো একটা পর্ণকুটির আছে সেখানে।

—জানি।

—অনেকে বলে porno কুটির। বাড়ির নাম 'কেঁচে গণ্ডুষ'।

—বাঃ! ওরিজিনাল নাম।

—যাই চলে?

—বলছি না, একদম না।

—বেশ। তাই হবে।

—জানেন, কাল আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি।

—এই রে! এবার আমার মরার সময় হয়েছে।

—একদম বাজে কথা বলবেন না।

—কেন? আমি মরলে তোমার কী?

—আমার কিছু হোক না হোক, আপনার অগণিত পাঠিকা একসঙ্গে গলায় দড়ি দেবে।

—আমার লেখা কি শুধু পাঠিকারাই পড়ে? আমার কি পাঠক নেই?

—অবশ্যই আছে। তবে তারা সংখ্যাতে অত ভারী নয়।

—তুমি না হয় কালই আমাকে স্বপ্নে দেখলে, আমি তো রোজই তোমাকে দেখি।

—এ কথা আর ক'জনকে বলেন?

—ওই তো তোমার দোষ। তোমাকে যা দিয়েছি, যা দিই, তার দাম বোঝো না বলেই অমন করে বলতে পার। তোমাকে অনেক দিয়েও যদি উদ্বৃত্ত কিছু থাকে তা অন্য এক বা একাধিক জনকে দিলে তোমার আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে।

তারপর বলল, তা স্বপ্নে কী হল তা একটু বলো শুনি।

—স্বপ্নে কি কোনও কিছুই হয়? হয় না বলেই স্বপ্ন এত দামি। দেখলাম, আমি আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়ির মস্ত বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বেলা পড়ে আসছে। শরতের বেলা। কমলারঙা বিধুর আলোয় চারধার রাঙিয়ে দিয়েছে। নানা পাখির কলকাকলিতে মুখর আকাশ বাতাস। এমন সময়ে আপনি বাগানের গেটে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, কুমু বাড়ি আছ? শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেমন করে 'অবনী বাড়ি আছ?' বলতেন, তেমনই করে। বলেই, গেট খুলে বাগানে ঢুকে এলেন।

আমাদের নাগচম্পা গাছের উঁচু ডালে ডাহুক বাসা বেঁধেছে। সেই বাসা আর নিচে নামা ডাহুকদের দিকে চেয়ে আমার আপনার কথা মনে হচ্ছিল। আপনার নাম ডাহুক কে দিয়েছিল? ডাহুকেরা তো ডুক্‌ডুক্‌ করে ডাকে আর সাবধানী পায়ে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে হাঁটে। আপনি তো বাঘের মতো হাঁটেন।

—আপনার নাম ডাহুক দিয়েছিলেন কে?

—নাম দিয়েছিলেন মা। আমি বড়ো হবার পর মা একদিন বলেছিলেন, আমার মামাবাড়ি হাজারিবাগের পগমল-এ। এক সুন্দর, সভ্য আর্টিস্ট ভদ্রলোক ছিলেন সে বাড়িতে। মাকে প্রথম যৌবনে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। তখনকার দিনে মেয়েদের নিজস্ব ইচ্ছা বলতে তো প্রায় কিছুই ছিল না। দাদামশাই মায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সম্বন্ধ করে, বেরসিক, বাঘ-শিকারি এক মাইনিং-এঞ্জিনিয়রের সঙ্গে। মানে, আমার বাবা। মা বোধহয় তাঁর সেই প্রেমিককে কোনোদিনই ভুলতে পারেননি। মানে, সেই আর্টিস্টকে। তাঁর নাম ছিল ডাহুক। তাঁর লেখা অনেকগুলো চিঠি মা আতর মাখিয়ে রেখে দিয়েছিলেন তাঁর চেস্ট-অফ-ড্রয়ারের মধ্যে। গভীর রাতে, টেবল লাইটের ডে-লাইট বাল্ব লাগানো সাদাটে আলোর বৃত্তর মধ্যে বসে সেই সব চিঠিগুলি মা পড়তেন, বাবা যখন কয়লা খাদানে যেতেন। চিঠিগুলো যখন পড়তেন মা, তখন মায়ের মুখ এক আশ্চর্য নরম আলোতে ভরে যেত। প্রেমের আলো। যা একজন মেয়েকে শুধু তাঁর প্রেমিকই দিতে পারেন এবং খুব কম স্বামীই তা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আগেই বলেছি, সেই আর্টিস্টের নাম ছিল ডাহুক। জীবনে সেই ডাহুককে পাননি বলেই তাঁর প্রথম পুত্রসন্তানের নাম রেখেছিলেন ডাহুক।

দাদামশাই বিয়ে দেননি তাঁর সঙ্গে মায়ের। কারণ, তখনকার দিনের আর্টিস্টদের চালচুলো ছিল না। পরবর্তী জীবনে পরিতোষ সেন, যোগেন চৌধুরী বা কেজিদা'দের মতো নামী আর্টিস্ট না হতে পারলেও ডাহুক সেন খুব বড়োমাপের আর্টিস্ট হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তাঁর এক একটি ছবি পঞ্চাশ-ষাট লাখ টাকাতে বিক্রি হত—বাবা সারা জীবনেও যা রোজগার করতে পারেননি।

আমার মায়ের মৃত্যুর পরের বছর ডাহুক সেন মারা যান প্যারিসে। তাঁর

একটি ছবি, মায়ের নামে যে ছবির নামকরণ করেছিলেন তিনি— 'সৌদামিনী'--লন্ডনে সাদবির বিশ্ববিখ্যাত নিলামঘর থেকে প্রায় এক কোটি টাকাতে বিক্রি হয়েছিল। এ খবর মায়ের মৃত্যুর পর আমি জেনেছিলাম। সেই 'সৌদামিনী' পরে কোন আমেরিকান বা জাপানি কালেক্টরের ঘরের দেওয়াল আলো করেছিল তা মা জানতেও পেলেন না। এখন মনে হয়, প্রকৃত প্রেমের পরিণতি এমনই হয়। সংসারের, দাম্পত্যের, নিত্যনৈমিত্তিকতার মালিন্যেও তা মলিন হয় না।৮

—সত্যি! তখন প্রেমিক-প্রেমিকারা কী সুন্দর সব চিঠি লিখতেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এস.এম.এস. বা সেলফোনের কথা নয়ত ইন্টারনেটের মাধ্যমেই প্রেমের কথা বলবে এবং তা নিয়ে তারা বাহাদুরিও করবে হয়তো। তাদের মন মুছে যাবে, হারিয়ে যাবে।

—কেন ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে তো রেখেও দিতে পারে।

—মোমের আলোতে বা টেবল-ল্যাম্পের আলোতে রাত জেগে লেখা এবং পড়া প্রেমের কাম-জরজর চিঠির তুলনা কি ইন্টারনেটের প্রেমপত্র কখনও-ই হবে? মনে হয় না।

—তারপর ডাহুক বলল, যাক গে যাক। তোমার স্বপ্নের কথাটাই শোনা হলো না ভাল করে। বলো না, তারপরে কী হল? কী দেখলে স্বপ্নে?

--কুমুদিনী বলল, আপনি বাগানের গেট খুলে ভিতরে এলে আমি বললাম, আপনাকে আমাদের বাগানের স্থলপদ্ম গাছ থেকে ছিঁড়ে এই বেলাশেষের একটি রক্তিমাভা স্থলপদ্ম আপনাকে দেব।

ডাহুক কথা কেটে বলল, দুসস্। আমি স্থলপদ্ম নিতামই না।

—তা হলে? কী নিতেন?

কুমুদিনী বলল।

—আমি তোমার রক্তিমাভা স্তনপদ্ম নিতাম। দু'হাতের করপুটে ধরতাম তাকে তোমার সামনে নতজানু হয়ে বসে, পরম সোহাগে।

—আপনি ভীষণই অসভ্য।

—কেন? স্তনপদ্ম শব্দটি পছন্দ হল না? উর্দু কবি সেই বলেছিলেন না?

"নীগাহ যায়ে কাঁহা সিনেসে উঠকর
হুঁয়াতো হুসন্‌কি দওলত গড়ী হ্যায়।"

—মানে? আমি উর্দু বুঝি না।

—একটু একটু বুঝলে ভাল করতে। উর্দুর মতো ভাষা বেশি নেই। মানে হল, বিধাতা তো সুন্দরীর সব দৌলত স্তনেই গড়ে রেখেছেন। চোখ, তাই স্তন ছেড়ে যে আর কোথাওই যেতে চায় না।

—এখন আমার আর কথা বলার সময় নেই। একেবারে উস্কোখুস্কো হয়ে আছি। একটু সাজুগুজু করতে হবে। পিকোদির বাড়ি যেতে হবে।

কুমুদিনী বলল।

—ডাহুক বলল,

"উলঝি সুলঝি রহনে দেও
কিঁউ শরপর আফৎ লাতি হো
দিলকা ধড়কান বাড়তি হ্যায়
যব বালোঁকা সুলঝাতি হো।"

—এরই বা মানে কী?

—মানে হল, যেমন আছ, তেমনি এসো আর কোরো না সাজ। তুমি উস্কোখুস্কোই থাকো। সাজগোজ করে আমার মাথার উপরে বিপদ কেন ডেকে আনবে বলো? তুমি সাজলে-গুজলে আমার বুকের ধুকপুকানি যে আরও বেড়ে যাবে। তাই লক্ষ্মীসোনা, সাজুগুজু কোরো না।

—আমি এবার অফ্ করছি মোবাইল।

উষ্মা দেখিয়ে বলল কুমুদিনী।

—করো। তোমার কি যেতে হবেই?

ডাহুক বলল।

—আরে! বললাম না, পিকোদির বাড়ি নেমতন্ন আছে। আজকে চিন্ময়দার জন্মদিন।

—দামড়া লোকগুলো জন্মদিন পালন কেন করে বলো তো? বাচ্চাদের জন্মদিন হয় তাও একরকম। তবু নামী-দামি মানুষ হলেও কথা ছিল। তোমার চিন্ময়দার মতো মার্কেনটাইল কোম্পানির বড় সাহেবের জন্মদিন

পালনের মধ্যে এক ধরনের আদিখ্যাতাপনা আছে। হাইট অফ নার্সিসিজম্।

—অমন করে বলছেন কেন? তাঁর কাছের মানুষেরা যদি ভালোবেসে তাঁর জন্মদিন পালন করেন তাতে আপনার গাত্রদাহ কেন?

—গাত্রদাহের ব্যাপার নয়। আমার এই সব নেকুপষুমুনু ব্যাপার ভালো লাগে না। মোমবাতি বসানো কেক, সামনে গিয়ে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে কেক কাটা, তারপর পরম বেসুরে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' গান গাওয়া, এই সব বিলিতি কেতা একেবারেই অসহ্য লাগে।

তারপরে ডাহুক বলল, আমাদের ভারতীয় মতে যদি জন্মদিন পালিত হয় তাও সহ্য হয়। সাহেবদের অনুকরণ করে আমরা অনেক কিছুই করি কিন্তু ন্যুইয়ার্স ইভ-এ লাল-নীল টুপি পরে বাঁশি বাজিয়ে ধুমসো-ধুমসো মানুষদের ধুমসি-ধুমসি অকালকুষ্মাণ্ড মহিলাদের সঙ্গে কুৎসিত নাচানাচি এবং বারোটা বাজলে মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে কামের কর্কশ চুমু খাওয়া—এ সবই অত্যন্ত কুরুচিকর বলে মনে হয় আমার। চিরদিনই মনে হয়েছে।

—আপনিও তো অনেক ক্লাবের মেম্বার।

—তা বটে। কিন্তু কোনও ক্লাবেরই ন্যুইয়ার্স ইভ বা ক্রিসমাস পার্টিতে আমি জীবনে যাইনি। এমনকী ক্যালকাটা ক্লাবের ইন্টারন্যাশনাল ইভিনিং-এও নয়। কেন জানি না, এসব বিজাতীয় ব্যাপারে আমার কখনও কোনও আকর্ষণ ছিল না। তাছাড়া, সকলেই যা করে, তা করার উৎসাহ আমার কখনওই হয়নি।

তারপর বলল, তুমি আমার সঙ্গে ডিসেম্বরের শেষে কোনও জঙ্গলে চলো। একত্রিশে রাত্রে, বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারের মধ্যে, যখন পাহাড়তলিতে নীল কুয়াশার মেঘ জমে, দূরের শীর্ণ নদীর উপরে শীতার্ত মোহানায় রাতে ইয়ালো বা রেডওয়াটেল্ড ল্যাপউইং যখন ডিড-ইউ-ড্যু-ইট, ডিড-ইউ-ড্যু-ইট করে লম্বা লম্বা পা ঝুলিয়ে বুকের মধ্যে চমক তুলে ডেকে ফেরে তখন বনবাংলোর সামনের ক্যাম্পফায়ারের আগুনে সাকলিং পিগের বার-বি-কিউ করা দেখতে দেখতে, রেড ওয়াইন খেতে খেতে, নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে কী ভালো যে লাগে, কী বলব! তারপর নতুন বছর এসে গেলে তোমারই মতো কোনও সঙ্গিনীর সঙ্গে

বাংলোর ভিতরে ঢুকে হিমশীতল শয্যাকে দুজনের শরীরের উত্তাপে উষ্ণ করে তুলতে যে কী আরাম, উত্তেজনা আর আনন্দ, তা যারা জানেনি কখনওই, তারাই এরকম বালখিল্যের মতো, বা বাফুনস্‌দের মতো লাল-নীল টুপি পরে বাঁশি বাজিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

—ও রকম লোভ দেখাবেন না। ভাল হবে না কিন্তু। শুধু মুখেই বলেন। নিয়ে তো গেলেন না একবারও জঙ্গলে, শুধু কথারই কথা।

—আমি তো নিয়ে যেতেই পারি। তোমার কি সাহস হবে?

—সাহসের পরীক্ষাটা একবার নিয়েই দেখুন না।

—বেশ। কথা দিলাম। এই শীতেই নিয়ে যাব তোমাকে।

—কোন জঙ্গলে?

—যে জঙ্গলে যেতে চাও। ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনে—যেখানে বলবে। আমি তো জংলী জানোয়ারই। বন্যেরা বনে সুন্দর, নারীরা আমার ক্রোড়ে। যাবে?

—যাব। কথা দিলাম। কিন্তু এবারে ছাড়তে হবে। আমাকে গান গাইতে বলেছে পিকোদি। চিন্ময়দাও আমার গান খুব ভালোবাসে।

—তোমার দুর্ভাগ্য যে কুমড়োপটাসদের গান শুনিয়ে গানের এবং নিজেরও এমন অবমাননা করো। যাকে তাকে গান শোনাও কেন? তোমার চিন্ময়দা রবীন্দ্রসঙ্গীতের কী বোঝে?

—আমি এবারে সত্যিই সুইচ অফ্ করে দিলাম মোবাইলের।

—ঠিক আছে। আমি রাত সাড়ে এগারোটাতে আবার করব। ততক্ষণে ফিরে আসবে নিশ্চয়ই। ততক্ষণে তোমাদের শান্তিনিকেতনের গাছগাছালি তাদের গায়ের গন্ধে শরতের রাতকে আমোদিত করে তুলবে। শিউলির গন্ধ ভাসবে পরিবেশে। তখনই ফোন করব। সাড়ে এগারোটার মধ্যে বুড়ো খোকার জন্মদিনে ইডিয়টিক উৎসব শেষ হবে তো?

—হোপফুলি। এখানে ট্রান্সপোর্ট একটা প্রবলেম। আমার অবশ্য গাড়ি থাকবে। সাইকেল-রিকশা। দুমকার বাসিন্দা রামদীন রিকশাওয়ালা। আমি যতদিন থাকি ততদিন ওকে অন্যের ডিউটি করতে দিই না। শুধু আমারই

খিতমদগারি করে ও তখন। দিন হিসেবে টাকা দিয়ে পুষিয়ে দিই ওকে।

—শান্তিনিকেতনে মোটরগাড়ি চলাচলই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যেখানে যা মানায়। সত্যি। শান্তিনিকেতনের পথে পথে রিকশা চড়ে বেড়ানোর মতো আনন্দ আর কিছুই নেই, তা কাঙ্কালিতলাতেই যাও কী কোপাইয়ে।

—আর কথা নয়। আমি কি একটু সাজব না?

—সাজো। বুড়োগুলোকে চমকাও। মানুষ যত বুড়ো হয় ততই যুবতীদের সঙ্গ চায়।

—আপনার মতো?

—আই অবজেক্ট। আমার বয়স সতেরো। আমি আজীবন নবীন-কিশোর। আমি বিধাতার ফ্লুক। আই আম অ্যান একসেপশান।





৩

—তুমি কোথায়?

—ডাহুক বলল, কুমুদিনী ফোনে এলে। ফোন একেক জন মানুষ একেক রকম করে ধরেন। কেউ কেউ ল্যান্ডলাইনের বেলাতে রিসিভার তুলে কম্প্যুটারের রেকর্ডেড মেসেজেরই মতো ফোনের নাম্বার বলেন। কেউ বলেন, 'বলছি'। কেউ যন্ত্রচালিতের মতো বলেন 'হ্যালো', দু-একজন তরুণ-তরুণী বলেন 'হাই'। আনন্দ পাবিলিশার্স-এর বাদল বসু বলেন 'হ্যালিও'। হয়তো ভাবেন, এ রকম উচ্চারণে সাহেবিয়ানাটা বেশি দেখানো হলো। কেউ কেউ সাহেবি কেতায় রিসিভার তুলে বলেন, মুকার্জি, চ্যাটার্জি, সানিয়াল ইত্যাদি। কুমুদিনী বলে, 'বলুন'।

—কুমুদিনীকে ফোনে পেলে, "তুমি কোথায়?" শব্দ দুটি যখন মন্ত্রোচ্চারণের মতো উচ্চারণ করে ডাহুক, তখন তার গলার স্বরে এমনই এক আর্তি উচ্চারিত হয় যে কুমুদিনীর মনে হয় যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল যেখানেই সে থাক না কেন ডাহুক তাকে যেন ঠিকই খুঁজে পাবে। ভারি উষ্ণতা মাখা থাকে শব্দ দুটিতে।

তুমি কোথায়?

উত্তরে কুমুদিনী বলল, এই তো ফিরলাম পিকোদিদির বাড়ি থেকে। এখন কটা বাজে?

—পৌনে এগারোটা।

—তোমার চিন্ময়দার বারোটা না বাজিয়েই চলে এলে?

—গতরাতের বারোটাতেই জন্মদিনে পৌঁছেছিলেন উনি।

—তা বটে। অনেক মানুষ গেছিলেন?

—অনেক নয়, তবে বিশিষ্ট ক'জন।

—যেমন?

—ওই চিত্রীরাই বেশি। চিন্ময়দা বড়ো চাকরি করা ছাড়াও নানা ইংরেজি পত্র-পত্রিকাতে ছবির সমালোচনাও করে থাকেন। আর পিকোদিদি তো নিজেই চিত্রী।

—ইনি কোন পিকোদি? জয়জ্যোতি সেন এর দিদি কি? যিনি আমাদের সঙ্গে জর্জদার কাছে গান শিখতেন?

—না, না সেই পিকোদি নন। এঁরা পূর্বপল্লীতে থাকতেন এক সময়ে। এই পিকোদির বাবা ছিলেন রায়বাহাদুর হুতোম সেন। নাম শুনেছেন?

—না। হুতোম প্যাঁচাদের খোঁজে আমার দরকার নেই। ইংরেজদের পা-চাটা মানুষেরাই 'রায়বাহাদুর', 'রায়সাহেব' ওসব হতেন, অনেকে টাকা দিয়েও হতেন। তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষকে জানার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে এবং হয়ে এই সার বুঝেছি যে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভাল মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য নন।

—আপনার লাইকিং-ডিসলাইকিং খুবই স্ট্রং না?

—হ্যাঁ। পজিটিভ মানুষদের তাই তো হওয়া উচিত। যাঁরা গাছেরটাও খান তলারটাও কুড়োন তাদেরই লাইকিং-ডিসলাইকিং মাইল্ড হয়। নীরেনদা, মানে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একদিন আমাকে বলেছিলেন, আমার হিতাকাঙ্খী বলেই, 'ওরে হনুমান! যেখানে প্রেমের সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়, সেখানে অন্তত প্রীতির সম্পর্ক রাখতে ক্ষতি কী? তাতে অমঙ্গলের চেয়ে

মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

আমি বলেছিলাম, আমার দ্বারা দ্বিচারিতা বা ভণ্ডামি করা সম্ভব নয়। ভণ্ডেরা পৃথিবীর যা-কিছু ভালো, সব পণ্ড করছে দু'বেলা। তাদের এড়িয়ে চলাই আমার পছন্দ।

—সেখানে কবি উৎপল বসুও এসেছিলেন, যোগেনদাও এসেছিলেন। কেজি'দা, গণেশ পাইন, সনৎ কর, শর্বরী রায়চৌধুরী। উৎপলদা তো প্রথম জীবনে প্যারিসে যোগেনদার ঘরেই থাকতেন। দারুণ মানুষ কিন্তু উৎপলদা। একজন ওরিজিনাল মানুষ।

—ওরিজিনাল কেন বলছ? উৎপলের পায়জামার ঘের মস্ত বড় এবং খুব উঁচু করে পায়জামা পরে বলে?

—বাজে কথা বলবেন না। আপনিও জানেন যে উৎপলদা একজন ওরিজিনাল মানুষ।

ডাহুক বলল, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণই সহমত পোষণ করি। তোমাদের শান্তিনিকেতনের আরও একজন ওরিজিনাল মানুষকে আমি চিনি।

—কে তিনি?

—সুবর্ণরেখার ইন্দ্রনাথ মজুমদার মশাই। সাইকেল চড়ে যাতায়াত করেন, বাংলা খান, অত্যন্ত উচ্চমানের প্রকাশক, এই দুই নম্বরি দুনিয়াতে একজন এক নম্বরি মানুষ।

তারপর বলল, 'হ্যালিও' বলে ফোন রিসিভ করলে কী হয়, আনন্দ পাবলিশার্স-এর বাদল বসুও একজন ওরিজিনাল মানুষ।

তারপর বলল, তবে হি হ্যাজ ফলেন ফ্রম দ্য গ্রেস অফ অরূপ সরকার, ইন দ্য রিসেন্ট পাস্ট, দ্য অলমাইটি। আনন্দবাজারে যাঁরাই কাজ করেন তাঁদেরই উচিত ছেলেবেলায় তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের চড়ার অঙ্কটা ভালো করে কষে আসা। ওইরকম মিউজিক্যাল চেয়ারের কোম্পানি বড় একটা দেখিনি যদিও অনেকই বড় বড় কোম্পানির অন্দরমহলের হাল-হকিকত আমি রাখতাম এক সময়ে। 'আনন্দবাজার' নাম বদলে ওই কোম্পানির

নামকরণ করা উচিত 'আসা-যাওয়ার হাট' কিংবা 'নিত্যানন্দের আখড়া'। আনন্দকে নিত্যই নবরূপে আগড় গড়ে রেখেছেন বলেই শুধুই আনন্দবাজারে আবদ্ধ না থেকে নিত্যানন্দ বাজার বলে পরিচিত হওয়া উচিত ওঁদের।

—আপনার ত সাহস কম নয়। আপনাকে মেরে শুইয়ে দেবে আনন্দবাজার। সেদিন আনন্দ পুরস্কারের আসরে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী কী বলেছিলেন কাগজে পড়েননি?

— না। কী বলেছিল?

—'হাতির বই' এবার পুরস্কার পেয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে বলেছিলেন রাজ্যপাল—আনন্দবাজারও হাতিরই মতো শক্তিমান। তারা তাদের শুঁড়ে যে-কাউকে উপরে তুলতে পারে আবার যে-কাউকে আছড়ে ফেলে পদপিষ্ট করতে পারে, এই রকম কিছু কথা।

যিনি পুরস্কৃত হলেন হাতির বই-এর জন্য, মানে হস্তী-পাণ্ডিত্যের জন্যে, তাঁরই মতো এই রাজ্যপালও অবশ্যই একজন হস্তী-পণ্ডিত অথবা চাটুকার।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বলল, কুমু, 'মুক্তধারা'তে আমি ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম।

তারপরই ডাহুক বলল, স্যরি, আজে বাজে কথা বলে শান্তিনিকেতনের এই শারদ রাতের বাতাবরণটাই ছিঁড়ে খুঁড়ে দিলাম।

—কত কিছু উদ্ভাবন হচ্ছে প্রতিদিন। ভাবি, কবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক জায়গার গন্ধ অন্য জায়গাতে পাঠানো যাবে।

কুমু বলল।

হয়ে যাবে, শিগগিরই। বিজ্ঞানের অসাধ্য তো কিছুই আর নেই।

—তা হলে এই রাতের সব গন্ধ পাঠিয়ে দিতাম আপনার কাছে। শিউলি গাছ আছে আমাদের বাড়ির বাগানে চারটি। কী শিউলি যে ফোটে। একটা গাছ আছে বারোমাস্যা। রাত যত গভীর হয় গন্ধ তত গাঢ় হয়।

—তুমি শুধু ফুলের গন্ধই পাও, গাছেদের গায়ের গন্ধ পাও না?

প্রত্যেক নারীর বগলতলির গন্ধ যেমন আলাদা আলাদা, প্রত্যেক গাছের কাণ্ড আর ডালপালার গন্ধও আলাদা আলাদা। তা চারিয়ে দেওয়ার জন্যে গাছকে শিক্ষা দিতে হয়।

—কাণ্ডরও আলাদা আলাদা গন্ধ? কী কাণ্ড!

কুমু বলল, বিস্ময় এবং শ্লেষের সঙ্গে।

—হ্যাঁ। কাণ্ডই বটে।

তারপরই বলল।

—শিউলির ভালো নাম তুমি জানো কি?

—না। কি? তাছাড়া শিউলি নাম হিসেবে খারাপটা কী? শিউলি ভালো হতে পারে, কিন্তু আরও ভালো নামও তার আছে।

—কী?

—হরশৃঙ্গার।

—তাই?

—হ্যাঁ। প্রমথ চৌধুরী, ওরফে বীরবল যখন ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছিলেন তখন একটা চিঠিতে ওঁকে লিখেছিলেন, ভৈরবীর মধ্যে কড়িমধ্যম এলে প্রাণের মূলে গিয়ে যেরকম আঘাত করে ঠিক সেই ভাবে (জানি না, তোমরা ভৈরবীতে কড়িমধ্যম লাগাও কি না। ওস্তাদি হিসেবে সেটা বেদস্তুর)....একটুখানি চাঁদের আলোয়, একটা ফুলের গন্ধ, একটা গানের সুর আমাদের প্রকৃতির আসল অংশটা হঠাৎ খুলে দেয়। তুমি সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব বলে যে সব জিনিস যে পৃথিবীতে আছে তা বিশ্বাস করো, আমিও করি, কিন্তু জিনিসগুলোর পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র গুটিকতক মাহেন্দ্রক্ষণেই হয়। নিজের চেষ্টায় হয় না, বাইরের সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব এসে তা ফুটিয়ে তোলে। একটি মানুষের ভিতর যা কিছু মহৎ, সুন্দর, মধুর, গভীর ভাব আছে তা একটা ফুলের গন্ধে যেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে তা অনেক ভল্যুম ফিলসফিতে পারে না। বা ওইরকমই কিছু।

—বাঃ। ঠিকই তো লিখেছিলেন।

—তুমি কি জানো যে চৌধুরীরা দুই ভাই-ই ইন্দিরা দেবীকে কায়দা

করতে রীতিমতো প্রতিযোগিতাতে নেমেছিলেন।

—না তো। অন্য চৌধুরী কে?

—আরে, আশুতোষ চৌধুরী। তিনিই দুজনের মধ্যে বড়। তাঁর নামেই এখন ওল্ড বালিগঞ্জ রোড এর নাম বদল করে নতুন নামকরণ হয়েছে। বিড়লা মন্দির, সানি টাওয়ার্স এবং চিফ জাস্টিসের অফিসিয়াল রেসিডেন্স যে রাস্তাতে সেই রাস্তাই এখন আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিন্যু।

—কলকাতা কর্পোরেশান মশা মারতে পারে না, পথের জল জমা বন্ধ করতে পারে না, পানীয় জল ঠিকমতো সরবরাহ করতে পারে না—শুধু মর্জিমতো পথের নাম বদলই করতে পারে। সেদিন কাগজে দেখলাম অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পুরনো লেকভিউ রোডের নামকরণ হলো। অশোকদার প্রতি আমার কোনো অসূয়া নেই। কিন্তু পঙ্কজ মল্লিক, দেবব্রত বিশ্বাস, নীলিমা সেন বা হেমন্ত মুখার্জি বা সুবিনয় রায়, কারো নামেই তো কলকাতাতে কোনো রাস্তা নেই—তাই হঠাৎ অশোকদার নামে রাস্তা করে দেওয়ার পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে তা বোধগম্য হল না।

—শুনেছি, যখন যে-পার্টির কব্জাতে থাকে কর্পোরেশন তখন তাঁদের ইচ্ছেতেই খুশিমতো তাঁরা নাম বদল করেন। এও শুনেছি যে, বিত্তবানেরা মোটা অর্থের অনুদান দিয়েও বাপ-ঠাকুর্দার নামে রাস্তার নামকরণ করিয়ে নিয়ে থাকেন আরোপিত কৌলিন্যের প্রতিফলিত গৌরবের জন্যে।

—এ সব কথা এখন থাক। আপনি এই শারদ রাতের আশ্চর্য সুন্দর বাতাবরণটি সত্যিই ছিঁড়ে খুঁড়ে দিলেন। আজ শুক্লা সপ্তমী। তাই চাঁদ উঠেছে অনেকই দেরিতে। কিন্তু তবুও রাত যেন রুপোঝুরি। আমাদের বাগানের কদম, কাঁঠালি-চাঁপা, অগ্নিশিখা, বসন্তি, শিউলি, বটল-ব্রাশ, গামহার, নলি বাঁশের ঝাড় (বড়মামা নিয়ে এসেছিলেন মধ্যপ্রদেশের অচানকমারের জঙ্গল থেকে অনেকদিন আগে) সব মিলে মিশে তাদের শরৎ-শিশির মাখা গা থেকে তুমুল কিন্তু নিস্তব্ধ গন্ধের কোলাহল তুলেছে। রাত এখন গভীর। পথঘাট শুনশান। কোথাও কোনো শব্দ নেই মনুষ্যসৃষ্ট। মুনিয়ামাসির বাড়ি থেকে এখন মার্জার-বাহিনীর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না কোনও। নইলে

তাদের অবিরত মিঁউ মিঁউ এই পাড়া গমগমিয়ে রাখে। দূরের পথের মোড় থেকে কুকুর ডাকছে একটা, থেমে থেমে। খোয়াই-এর বুক চিরে রেল গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শান্তিনিকেতনে রাতে রেলগাড়ির আওয়াজ শুনলেই আমার রবিঠাকুরের সেই কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়, "রাতের রেলগাড়ি দিল পাড়ি। গাড়ি ভরা ঘুম কামরা নিঝুম।" কোটেশানে ভুল হল কি? হলে হোক।

—বলেই কুমুদিনী বলল, ভুল হলো কি?

ডাহুক বলল, ঠিক না ভুল তা আমি বলতে পারব না। আমার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। ডঃ সেনগুপ্ত বলেছেন, আমার মস্তিষ্ক শুকিয়ে আসছে। জানালার সামনে আমার মস্তিষ্কের এম.আর.আই. রিপোর্টটিও ধরে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, দেখেছেন?

দেখলাম, আমার মস্তিষ্কটা দেখতে একেবারে একটি রোঁয়া-ওঠা মুরগির ছানার মতো. যে-সাইজের মুরগি দিয়ে প্রতি সন্ধেতে ইমরান বাবুর্চি ঠাকুমার জন্যে চিকেন-সুপ বানাত।

—ড. সেনগুপ্ত আর কী বলেছিলেন?

—বলেছিলেন, এর পরে হয়ত ডিমেনসিয়া হবে। তারও পরে অ্যালঝাইমার্স।

সেটা কী?

পথে বেরিয়ে নিজের নাম, ঠিকানা সব ভুলে যাব। দারুণ ব্যাপার বটে। যাই বলো আর তাই বলো।

ডঃ সেনগুপ্ত বললেন, দেখেছেন? ব্রেনটা কেমন শুকিয়ে আসছে।

—আপনি কী বললেন?

কুমু জিগগেস করল।

—আমি উদ্বিগ্ন গলাতে বললাম, তাহলে কী হবে? ড. সেনগুপ্ত বললেন, বয়স তো হয়েছে। বয়সে সকলেরই ওরকম হয়। যাঁরা ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করেন তাঁদের আরও তাড়াতাড়ি হয়। চিরদিনই কি নবীন কিশোর থাকবেন?

—তাহলে ড্রিঙ্ক করা কি ছেড়ে দেব? তাছাড়া, রোজ আমি করিও না।

তিন সঙ্গীর 'রবিবার' গল্পের অভীকের মতো আমারও মত এই যে, কোনো নেশাকে আমি পেতে পারি কিন্তু কোনো নেশা আমাকে পাবে, সেটি হচ্ছে না।

আমি বললাম।

ড. সেনগুপ্ত বললেন, কেন? ছাড়বার কোনোই দরকার নেই। এনজয় ইওর লাইফ। ইট মে মেক আ ফিউ মান্থস ডিফারেন্স। দ্যাটস অল। বেশ অনেকদিন বাঁচবেন মশায়। আর বাঁচলেনও তো রমরম করেই। তাহলে হোয়াটস দ্যা রিগ্রেট ফর?

—এতদিন ইংল্যান্ডে প্র্যাকটিস করে আসা ডাক্তারও আপনাকে এমন ভয় পাইয়ে দিলেন? এটা কি উচিত কাজ হলো ওঁর?

—অবশ্যই উচিত কাজ হলো। আমার শুধু ঐ একটাই ভয়। অ্যালঝাইমার্স। এইরকম ডাক্তারই আমার পছন্দ, যিনি স্তোক দেন না।

কী ভয়?

যদি কোনও দিন তোমার সুন্দর মুখটাকেও আর মনে করতে না পারি? তাহলে আর বাঁচব কী নিয়ে? এ ছাড়া শারীরিক কোনও ক্লিষ্টতা নিয়ে আমি কোনোদিনই মাথা ঘামাইনি। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একটি কথা বলতেন, খুব দামি কথা, অবশ্য উনি অনেক দামি কথাই বলতেন।

—কী কথা?

—বলতেন, "নাথিং ক্যান হ্যাপেন টু মি হুইচ হ্যাডন্ট হ্যাপেনড টু সামওয়ান এলস বিফোর।"

—সত্যিই দারুণ।

কলকাতাতে ফিরলে তোমাকে একটা বই পড়তে দেব। হেমিংওয়ের বন্ধু এ. ই. হচনার-এর লেখা "হেমিংওয়ে"।

—কী আছে সেই বইয়ে?

কী নেই? হেমিংওয়ে সম্বন্ধে লেখা। হিলারিয়াস বই।

বলেই, ডাহুক বলল, এই মাঝরাতে অর্গান বাজিয়ে কে গান গাইছে?

—বিন্তিদিদি।

—বিন্তিদিদি কে?

—আপনি চিনবেন না। বস্তিদার ছোট বোন। মাথার গোলমাল আছে। তবে বদ্ধ পাগল নন। মাঝে মাঝে লুসিড ইন্টারভ্যাল্‌স আসে। খুব সুন্দর দেখতে বিন্তিদিদিকে। অমর্ত্যদাকে ভালবাসতেন।

—অমর্ত্যদা, মানে অমর্ত্য সেন?

—আশ্চর্য! শান্তিনিকেতন জায়গাটাতেও কি একজনই অমর্ত্য আছেন না কি?

—না, তা নয়।

—তবে তিনি তো গ্রেট ম্যান। শান্তিনিকেতনের গর্ব।

—তা ঠিক। ডাহুক বলল।

তারপরে বলল, আমিও গ্রেটই মনে করতাম কিন্তু সারা জীবন শান্তিনিকেতনে ট্রেনে করে এসে সাইকেল আর সাইকেল রিকশা চড়ে বেড়িয়ে, নোবেল পেয়ে, আবার পরে প্রচণ্ড বড়লোক, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অ্যামেরিকান তিন নম্বর বউকে ইমপ্রেস করার জন্যে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে হেলিকপ্টারে চড়ে এলেন। এটা কেন যে করলেন আমার ঠিক বোধগম্য হলো না। ...'স্ট্রেন্থ অফ আ চেইন ইজ ইটস্ উইকেস্ট লিঙ্ক'। আমার মানসলোকে অমর্ত্য সম্বন্ধে যে বেলুনটি বহু বছর ধরে বড় হচ্ছিল তা ঐ ঘটনাতে হঠাৎ পটাং শব্দ করে ফেটে গেল।

তারপর কুমুদিনীকে কিছু বলতে না দিয়ে বলল, তোমার বিন্তিদি কী গান গাইছেন?

উনি গান করেন না, শুধু বাজান। যদিও চমৎকার গান করেন যদি কখনও গান করার ইচ্ছে করেন। তবে সচরাচর গান না, বিশেষ করে এত রাতে।

—কী গান বাজাচ্ছেন বলো না?

—'হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিকে, হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।'

—তা এই শারদ রাতে হেমন্তের গান কেন?

—ওঁর ইচ্ছে। তা না হলে মাথার গোলমাল আছে বললাম কেন? বিস্তিদি এত ভাল অর্গান বাজান যে ঋতুচক্র তাঁর বাজনার পিছু পিছু যায়, ওঁর আঙুলেই ঋতুর জন্ম হয় আর ঋতু ঝরেও যায়। উনি মানুষী নন, গান্ধর্বী।

—বাঃ ভারি সুন্দর করে বললে তো ! আহা! বয়স কত?

—তা প্রায় ষাটের কাছাকাছি হবে এখন। কিন্তু হলে কী হয়! এখনও যেদিন সাজবেন বলে মনে করেন সেদিন বাগানের সব ফুলের মুখ মলিন হয়ে যায়। আমি আর আপনি যদি একই সঙ্গে যাই কখনও আসি এখানে, তখন আলাপ করিয়ে দেব বিস্তিদির সঙ্গে।

—নিজের কপাল নিজে পোড়াতে চাও তুমি? ওঁকে দেখে, ওঁর সঙ্গে আলাপিত হয়ে যদি মন সরে যায় আমার?

—সরে গেলে, যাবে।

—অমন ওভার-কনফিডেন্ট হয়ো না। তুমি কখনও সুন্দরবনে গেছ?

—কোনও বনেই যাইনি। আজ পর্যন্ত তো কত বনেই নিয়ে যাবেন বললেন, নিয়ে গেলেন আর কোথায়?

—মন-বনে নিয়ে গেছি, নিয়ে যাই বারেবার। এই তো তুমি আমার মন-বনেই আছো, আছো অন্তরে।

—আপনার সঙ্গে কথায় পারা সম্ভব নয়।

—শুধুই কথাতে কেন? পরীক্ষা করে দেখতো পারো, অন্য অনেক কিছুতেই পারা সম্ভব নয়।

—সুন্দরবনের কথা কী বলছিলেন?

—হ্যাঁ। বলছিলাম, সুন্দরবনে দেখেছি, মোটর বোট যখন রাতের মতো নোঙর করা হয় তখন সারেঙ একাধিকবার নোঙর ফেলে উঠিয়ে বোট আগে পিছে করে দেখে নেয় নোঙর ঠিকমতো মাটি কামড়ে রয়েছে কী না।

—কেন অমন করে?

—না করলে, জোয়ার দিলে রাতের বেলা নোঙর হেঁটেও যেতে পারে। আর নোঙর হেঁটে গেলে, মানে, সরে গেলে, বোটের একদিক যদি ড্যাঙ্গায়

ঠেকে যায় তবেই তো চিত্তির কি না!

—কেন? চিত্তির কেন?

—মামা আছে না? যে মামাকে ঠকাবার জন্যে বনবিবি, বাবা দক্ষিণ রায়, আরও অনেকেরই পুজো দেয় ওরা।

—সত্যি! কত জানেন আপনি!

—ঠাট্টা করছ? সত্যিই জানি। দুঃখ ওইটুকুই যে সব জ্ঞানই বৃথা গেল। কেউই তার একটুও নিয়ে আমার ভার লাঘব করল না। এই জ্ঞানের বোঝা বুকে নিয়েই চলে যেতে হবে যে কোনও দিন পরপারে। আজকাল স্বপনপারের ডাক যে প্রায়ই শুনি।

—তারপরই সম্ভবত চার্জ চলে গেল কুমুদিনীর মোবাইলের। অথবা ইচ্ছে করেই সুইচ অফফ্ করে দিল। পাগল ডাহুকের কথা তো শেষ হয়েও হয় না। ডাহুক দেখল, ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে।





৪

পুজো পেরিয়ে গেছে। পুজোর লেখালেখির পরে এখন পুজো সংখ্যা পড়ার সময়। অনেক কাগজই পড়তে হয়। তরুণদের লেখা যত্ন করে পড়ে ডাহুক। কেউ ভালো লিখলে তাকে চিঠি লেখে। এখন নতুন লিখিয়েদের মধ্যে মেয়েরা পাদপ্রদীপে এসেছে। তাদের লেখাও ডাহুক মনোযোগ দিয়েই পড়ে। মেয়েরা যে তাদের যুগ যুগ সঞ্চিত নানা সংস্কার, লজ্জা ও কুণ্ঠা কাটিয়ে উঠে অনেক পুরুষ লেখককেও লজ্জিত করার মতো সাহসী লেখা লিখছে এটা দেখে ভালো লাগে ডাহুকের। তবে কখনও কখনও শুধু সাহস দেখানোর জন্যেই সাহসী হওয়াটাও চোখ এড়িয়ে যায় না। একজন লেখক বা লেখিকা যাইই লিখুন না কেন সেই লেখা তাঁর অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসা উচিত এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতানির্ভরও হওয়া উচিত। তা হলেই সব দোষ মাফ করে দেওয়া যায়। এ ছাড়া, এতে দোষেরই বা কী আছে!

একটা পুজো উদ্বোধন করতে ব্যাঙ্গালোরে থুড়ি, বেঙ্গালুরুতে এসেছিল ডাহুক, তারপর সেখানেই রয়ে গেছে। রঞ্জন ঘোষাল আর সঙ্গীতা আছে

ব্যাঙ্গালোরে—যাদের আকর্ষণ চুম্বকের মতো। পাহাড়ি আছে, ছেলেবেলার বন্ধু, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, আই.আই.টি. ব্যাঙ্গালোরের ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বড় সাহেব ছিল। এর-ওর বাড়ি আড্ডা মেরে আর নিমন্ত্রণ খেয়ে কী করে যে পনেরোটা দিন কেটে গেল তা ভাবলেই অবাক লাগে। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে আবারও যেতে হয়েছিল একটি কাজে।

ডাহুক যখন বাইরে থাকে মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে যায় না। এ কথা শুনলে সকলেই অবাক হন। কিন্তু ডাহুক মনে করে, বাইরে যাওয়া মানে নিজের ভিতর থেকেও বাইরে যাওয়া। তার এমন কেউই নেই যার সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখতেই হবে বা তার ওপরে কেউ তেমনভাবে নির্ভরশীল। অন্য কেউই তাকে তেমন করে চায়ও না। যে মরে গেলেও ব্যথিত হবার মতো রক্তসম্পর্কের মানুষ বিশেষ কেউই নেই। ব্যথিত হবেন হয়তো কোনও কোনও পাঠক-পাঠিকা। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও তাঁরাই ডাহুকের একমাত্র আত্মীয়। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তার স্বার্থহীন ভালবাসার সম্পর্ক।

কুমুদিনীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে একবার মোবাইল ফোনটা নিয়ে যাবে ভেবেছিল রোমিং-ও করা আছে। তার পরে ভাবল, কুমুদিনী তো তাকে ভালবাসে না। ভালোবাসার ভান করে শুধু। তার সমবয়সী কত চাইয়ে আছে। তার স্বামী স্বামীর সঙ্গে কুমুদিনীর সর্ম্পকটা যেন কেমন ভাসা ভাসা। হয়তো ডাহুকের ভুলও হতে পারে। ঐ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের হয়তো ডাহুক ঠিক বুঝতেও পারে না। সে যে বুড়ো হয়ে গেছে। তার জন্যে যে কারোরই কিছুমাত্র যায় আসে না এ কথা জেনে এক দিক দিয়ে বেশ ভালোই লাগে, ভারশূন্য লাগে।

কলকাতায় যখন ফিরল তখন বেশ হালকা শীত। ইতিমধ্যে নাগপুর থেকে একটি ফোন এল, সুদীপ্ত সেনগুপ্ত নামক এক তরুণের—তিনি ডাহুকের এক পরিচিতর রেফারেন্স দিয়ে ফোন করলেন। বললেন, নাগপুরে তাঁরা বাংলা মাধ্যমের স্কুল চালান, মস্ত বড় পাঠাগার আছে, দুর্গাপুজো করেন—মহারাষ্ট্রে বাংলা সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখা এবং প্রসারের প্রাণপণ চেষ্টা

করছেন। ওঁরা চান যে ডাহুক যেন নভেম্বরের গোড়াতেই একবার নাগপুরে যায় একটি আলোচনা সভাতে যোগ দিতে। পরদিন থেকে, গানও গাইতে হবে।

ডাহুক বলেছিল, জঙ্গলে যদি নিয়ে যান তাহলে যাব। মহারাষ্ট্রের কম জঙ্গলেই গেছি আমি।

উনি বললেন অবশ্যই নিয়ে যাব। আপনার সঙ্গে জঙ্গলে যেতে পারলে আমাদেরও অনেক দিনের সাধ মিটবে। ক্যুরিয়ারে আমরা প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছি। রিটার্ন ওপেন। জঙ্গল থেকে ফেরার পর ফেরার তারিখ ঠিক করলেই হবে।

অনেক দিন কুমুদিনীর সঙ্গে কথা বলে না। কুমুদিনী তো ওকে ফোন করে না। করলে, ডাহুক কলকাতায় ফেরার পর গত দশ দিনে একবার ফোন করে দেখতে পারত। এই অসমবয়সী সম্পর্ক রাখার দায়টা যেন পুরোপুরিই ডাহুকের একারই। কুমুদিনী 'নেসেসারি ইভিল'-এর মতো এই সম্পর্কটা বাঁচিয়ে রাখে। দয়া করে। এই কথাটা ভাবলেই বড় অপমান বোধ হয় ডাহুকের। তাই ও একবারও ফোন করেনি এত দীর্ঘ ব্যবধানের পরও। যদি নাই চায় কুমুদিনী, তাহলে জোর করে এ সম্পর্ক জিইয়ে রাখবেই বা কেন ও? যে সম্পর্কের কোনও পরিণতি নেই তাকে সার দিয়ে জল ঢেলে বাঁচিয়ে রেখে লাভই বা কী?

এমনই সময় এক বিকেলে একটি চিঠি এল। আজকাল চিঠি লেখার চল উঠেই গেছে। আগে পুজোর পরে বিজয়ার চিঠির পাহাড় জমত, তার মধ্যে কর্তব্যের চিঠিই অবশ্য বেশি। প্রথারক্ষা। বিজয়ার আশীর্বাদ। ভালবাসা, শুভেচ্ছা জেনো, বাড়ির সকলকে জানিও।

Dahuk dutta and fly এই নামেও বহু চিঠি আসত। Family fly হয়ে যেত। কিন্তু ডাহুকের fly যে fly করে চলে গেছে তা তো পত্র লেখকদের সবাই জানেন না।

খুলল চিঠিটা সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে। খামের চিঠি। কম্পিউটারের কাগজে লেখা, সংক্ষিপ্ত চিঠি।

কলকাতা

৩.১১.০৬

ডাহুকদাদা,

কী ব্যাপার! আপনি আমাকে ত্যাগ করলেন কেন? গত প্রায় দেড় মাস আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি কিন্তু বৃথা। মোবাইল অফফ্ করে রেখেছেন, ল্যান্ড লাইনে করলেও বেয়ারা কেবলই বলে, "সাহেব কলকাতাতে নেই।"

কবে ফিরবেন?

জানি না। আপনার নাম কী মেমসাহেব?

মনে মনে প্রতিবারই বলতাম, যে নিজেকে ইচ্ছে করে হারিয়ে দেয় তার অন্যের শুভ বা অশুভ নামে প্রয়োজন কী? তাই একবারও আমার নাম বলিনি। আপনি কোন জাহান্নম বা জন্নাতে গেছিলেন তা জানার আমার কোনও উৎসাহ নেই। শুধু কলকাতায় ফিরলে একটা খবর দেবেন।

আপনি একটি এক নম্বরের ফ্লার্ট। আমার চেনা-জানা অনেকেই এ কথা বলেছেন। আমি নিজে জীবনে কারও সঙ্গে ফ্লার্ট করিনি—ফ্লার্ট যারা করে তাদের আমি পছন্দও করি না। যে সম্পর্কের ঠাঁই এতদিনেও দৃঢ় হল না তাকে ঠাঁই-নাড়া করতে আমার আর কোনও অসুবিধে নেই।

এ চিঠির যদি উত্তর না পাই, রিজনেবল টাইমের মধ্যে, তা হলে বুঝব যে, এই সম্পর্ক আপনি রাখতে চান না।

আশাকরি, বহাল তবিয়তেই আছেন, যেমন থাকেন।

—ইতি কুমুদিনী

ডাহুক দত্ত

কলকাতা—৭০০০৯১

কুমুদিনী,

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পেলাম।

চিঠি পড়ে জিগর মোরাদাবাদীর একটি শায়রীর কথা মনে পড়ে গেল।

"উনকি আতি হ্যায় মেরা পেয়ার পর গুস্‌সা
মুঝকো গুস্‌সে মে পেয়ার আতি হ্যায়"।

তুমি তো বলবে, মানে কী?

মানে হল, ওকে আমি ভালবাসি, তাই ও ভারি রাগ করে আমার উপরে আর আমার সেই রাগ দেখে আরও বেশি করে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কী আর বলব! মনে ভয় হয়েছিল এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তুমি বুঝি আর আসবে না। কিন্তু "অব আ গয়ে, অব তো আতা নেহি ইয়াদ বরনা কুছ হমনে আপসে কহনা জরুর থা"।

মানে, তুমি যখন এসেই গেলে কাছে, আবার এলে, তখন মনে কিছুই পড়ছে না আর। অথচ বলার কত কথাই না ছিল তোমাকে, একান্ত গোপনে।

রাগ কোরো না গো আমার কুমুদিনী, কমলিনী। রামকুমারবাবু একটি গান গান না?

"কমলিনী কেন অভিমান, ভ্রমরে?
নয়ন অনন্তর হইল যন্তর, সতত সে, কাতরে.....।
অন্য অন্য ফুলগণ, আমি জানি সকলের প্রাণ
আমারো তো হয় উচিত, তুষিতে সবারে....
কমলিনী কেন অভিমান, ভ্রমরে....."

তবে আমার বেলা এ গানের বাণী প্রযোজ্য নয় কারণ আমার তুমি ছাড়া অন্য কোনও ফুল নেই। তাই তো তুমি ছাড়া চলে না আমার।

ছেলেবেলা থেকেই আমি এ রকম। কোনও সুন্দর খেলনার জন্যে বায়না ধরে কেঁদে কেটে তা পাবার পর তাকে জড়িয়ে ধরে থেকেছি রাত দিন, যেখানে গেছি, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছি, তাকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থেকেছি সারা রাত। তার পরে অনবধানে তাকে ঢুকিয়ে রেখেছি বিস্মৃতির দেরাজে অথবা হারিয়ে ফেলেছি কোথাও। তার পরে আবার নতুন খেলনার জন্যে বায়না ধরেছি।

কিন্তু সে সব ছিল ছেলেবেলায়। পেয়েছি এবং ভুলে গিয়েছি। এখন

পাওয়ার ঘরে অতি সামান্যই আছে বলে ভুলে যাওয়া বা ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তোমাকে যখন পেয়েছি, সাত রাজার ধন, আমার অনেক আদরের কুমুদিনী, তোমাকে আর কোনও মতেই ছাড়ছি না।

আমি কালই নাগপুরে চলে যাচ্ছি। সেখান থেকে জঙ্গলে যাব। এত স্বল্প সূচিতে তুমি তো যেতে পারতে না—তাই তোমাকে পরে অন্য কোনও জঙ্গলে নিয়ে যাব। মহারাষ্ট্রের কোন জঙ্গলে ওঁরা আমাকে নিয়ে যাবেন তা জানি না। সেখান থেকে চিঠি লিখব তোমায়। বাইরে আমি মোবাইল নিয়ে যাই না—তা ছাড়া জঙ্গলে টাওয়ার থাকে না বলে ফোন কাজও করে না। তাই চিঠিই ভাল।

ফিরে এসে ফোন করব তোমাকে। ভাল থেকো।

ইতি—তোমার রূপ ও গুণমুগ্ধ ডাহুক দত্ত।





৫

নাগপুর, মহারাষ্ট্র

কল্যাণীয়াসু কুমুদিনী,

নাগপুরে এয়ারপোর্টে রাতের বেলা নামতেই বোঝা গেল যে যাঁদের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি তাঁরা মানুষ খুবই ভাল, আন্তরিক, ইনফরম্যাল এবং সিনসিয়ার। সম্ভ্রান্ত সেমিনারি হিলস্-এর এলাকার মধ্যে মহারাষ্ট্র স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এর গেস্ট হাউসটিও চমৎকার। সার্ভিসও ভাল। তবে যত ভাল হওয়া উচিত ছিল তত ভাল নয়। তবে, এঁদের দোষ দেওয়া যায় না। যে ক'দিন আমি নাগপুরে ছিলাম, একদিনও রাত একটার আগে খাওয়া দাওয়ার পর্ব মেটেনি। তবে পশ্চিমবঙ্গের তুলনাতে এদের সবকিছুই ভাল। পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্কৃতি যে কতখানি খারাপ হয়ে গেছে, তা সম্ভবত যে কোনও অন্য রাজ্যে গেলেই বোঝা যায়।

এঁরা একটি আলোচনা চক্র করছেন—"Influence of Globalisation on Bengali Literature and Culture"। আমার বক্তৃতা ফ্যাক্সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রথমদিন রাতে আলোচনা সভা এবং পরদিন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে আমাকে গান গাইতে হবে।

সেমিনার অন্য একটি হলে হলো। নামটা ভুলে গিয়েছি। সেখানে প্রায়

সাড়ে সাতশ মানুষ এসেছিলেন। এক প্রশ্নোত্তর পর্বে অনেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। পরদিন গানের আসরে ডায়াসে যেমন ফরাস ছিল, তেমনই শ্রোতাদের জন্য মাটিতে ফরাস পেতে বসার বন্দোবস্তও ছিল। হাঁটুর রোগীদের জন্য চেয়ারও ছিল।

আমি গাইবার আগে স্থানীয় এক ভদ্রলোক গাইলেন। নাম মনে আছে, কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। ভাল গাইলেন। তার আগে গাইলেন তোমাদের শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত ভি ভি 'ওয়াঝালকার মশায়ের কন্যা অরুন্ধতী। এখন দেশমুখ। উনি শান্তিনিকেতনেই পড়াশোনা করেছেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতই গেয়ে থাকেন। গানও ভাল। তবে গলাটি পাতলা। গলা ঈশ্বরের দান। তার অভাব বা খামতিতে গায়ক বা গায়িকার নিজের কোনও কৃতিত্ব বা দোষ নেই। তার মাধুর্যে এবং গাম্ভীর্যে যেমন গায়ক-গায়িকার বাহাদুরি নেই কোনও।

রামকুমারদা এবং আমার পুরাতনী গানের বেশ কিছু শ্রোতা যে ওখানে আছেন, তা জেনে অবাক লাগল। আমার গান ওঁরা মূলত দূরদর্শনেই শুনেছেন অবশ্য। ক্যাসেটও আছে কারও কাছে। এই ধরনের পুরাতনী, নিধুবাবু এবং অন্যদের টপ্পা এঁরা বেশি শুনতে পান না। আমি খালি গলাতেই গেয়েছিলাম। কারণ, যথেষ্ট মহড়া আগে দেওয়া না থাকলে এবং বাজিয়ে, বিশেষ করে তারের বাজনদারের পক্ষে আমার সঙ্গে বাজানো সহজ নয়। এবং কানের কাছে একটি স্বর যদি বেসুরো বা কম সুরে বাজে তা হলেই গান গাওয়া আমার পক্ষে অসুবিধার হয়। যাই হোক, প্রায় হাজারখানেক মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সোয়া ঘন্টার উপর গান যে শুনেছিলেন সে কৃতিত্ব তাঁদেরই। অরুন্ধতী দেশমুখ আমার গান শেষ হলে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, দাদা, এমন গান জীবনে শুনিনি। ও বিনয়ী এবং অশেষ গুণগ্রাহী। তাই অমন করে বলল যে তা জানি। তবু শুনে ভাল লাগল। অবশ্য 'এমন গান' বলতে এমন থার্ডক্লাশ গানও বুঝিয়ে থাকতে পারে।

যে চার রাত নাগপুরে ছিলাম সেই চার রাতেই শুতে শুতে রাত একটা হয়েছিল। উদ্যোক্তারা এবং তাঁদের স্ত্রীরা সকলেই গেস্ট হাউসে নানা খাবার বানিয়ে নিয়ে চলে আসতেন এবং গান শুনতেন। গানকে এবং বিশেষ করে

পুরাতনী গানকে ওঁরা সত্যিই খুব ভালবাসেন।

তৃতীয় দিন সকালে একটি Qualis গাড়িতে করে ওঁরা আমাকে নিয়ে চললেন তাড়োবা টাইগার রিজার্ভ-এর দিকে।

গতবছর উত্তরবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বন-বিভাগের উপদেষ্টা কমিটির মিটিং-এ যোগ দিতে গিয়ে সুক্না থেকে চাপড়ামারি যাওয়ার পথে বনবিভাগের মারুতি জিপসি গাড়ির ড্রাইভার একটি দেড়-টনি মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা মারে। জিপসি উলটিয়ে যায় বাঁ দিকে। আমি বাঁদিকেই সামনে বসে থাকায় আমার মাথার বাঁদিকে এবং হাঁটুতে চোট লাগে। চিফ কনজার্ভেটর অতনু রাহারও (তখন কনজার্ভেটর) মাথা ফেটে যায়। অদ্যাবধি আমার মাথার যন্ত্রণা আছে এবং স্মৃতিশক্তিতে নানা গোলমাল দেখা দিয়েছে। তাই জিপসিতে চড়তে ভয় পাই। ভয় পাই বলেই Qualis গাড়ি নিয়েছিলেন ওঁরা। অতনু এখন পশ্চিমবঙ্গ বনবিভাগের প্রিন্সিপাল চিফ কনসাভেঢর।

এই ছেলের দল অতি চমৎকার এবং শিক্ষিত মানুষ। কেউ কেউ এঞ্জিনিয়র, কেউ অধ্যাপক, কেউ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করেন। কেউ বা সাংবাদিক, কেউ ফোটো সাংবাদিক। বয়সে যেমন তরুণ, মনেও উদ্দীপ্ত। সুদীপ্ত ভট্টাচার্যি, ধূর্জটি গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদীপ মৈত্র, তাপস সাহা, সঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা এবং এঁদের স্ত্রীরা প্রত্যেকেই সাহিত্য ও সঙ্গীত-রসিক। তবে সঞ্জীবের স্ত্রী সুচিত্রা বোধ হয় বেশি পড়ে না। মনে হয়।

তড়োবা বা তাদোবাতে দু'দিক দিয়ে যাওয়া যায়। নাগপুর দিয়ে চন্দ্রপুর হয়ে গেলে পথ একটু বেশি পড়ে কিন্তু পথ চমৎকার। আমরা অন্য পথটি দিয়ে গেছিলাম। সে পথে গাড়ি বা বাস ট্রাক কম কিন্তু কম বলেই চারঘন্টার পথে মধ্যাহ্নভোজনের ভদ্রগোছের একটিও জায়গা নেই। তবু, আমরা একটি ধাবাতে রুটি-তড়কা খেলাম। সেটিকে ধাবা না বলে অ্যাপলজি ফর আ ধাবা বলাই ভালো।

শেষ দুপুরে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা তাড়োবাতে। ফেরার সময় ফিরেছিলাম মোহার্লির গেট পেরিয়ে চন্দ্রপুর হয়ে। এখানে এনটিপিসি-র

থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট আছে। তাড়োবার ভি আই পি রেস্ট হাউসে উঠলাম এসে। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এর মতোই বন্দোবস্ত। Split A.C. থেকে Room Heater কোনও কিছুরই অভাব নেই। সামনেই তাড়োবা হ্রদ। মস্ত নীল হ্রদ। চতুর্দিকে জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা। হ্রদে অনেক কুমির আর কচ্ছপ আছে! হরিণ সম্বর জলে নামলেই কুমিরেরা তাদের ধরে ফেলে। মানুষে তাই জলের কাছেও যায় না। কতগুলো কুমির আছে তা কেউই বলতে পারল না তবে রেঞ্জার সাহেব বললেন, পঞ্চাশ-ষাটটা তো আছেই। এই বনের নাম তাড়োবা অথবা আন্ধেরি তাড়োবা টাইগার রিজার্ভ। ভারতের অন্যতম পুরনো টাইগার রিজার্ভ। জনশ্রুতি আছে, যে এক সময় এই উষর বনময় অঞ্চলে এক দল মানুষ বনমধ্যে পিপাসাতে প্রায় মরতে বসেছিল। সেই সময় জঙ্গলের দেবতা বলেন, যে একজন মানুষ বলি দিলে জল দেবেন তিনি। তাড়ু নামের এক মারাঠি যুবককে তারা তাই দেবতাকে নৈবেদ্য দেয়। সেই থেকেই এই হ্রদের নাম তাড়োবা। তাড়ু থেকে তাড়োবা। আর আন্ধেরি একটি নদীর নাম। পাহাড়ি ঝোরা যাকে বলে। গ্রীষ্মে বা শীতে বোঝারই উপায় থাকে না নদীর অস্তিত্ব, কিন্তু বর্ষায় সে প্রলয়ংকরী হয়ে ওঠে।

তার প্রাবল্যে ভেসে যায় বনমধ্যের অনেক ব্রিজ, এমনকী, অনেক কজওয়ের কংক্রিটের পাটাতনকেও উল্টে পাল্টে দিয়ে যায়। তাই পরের বর্ষা আসার আগেই সেই সবের মেরামতির কাজ চলছে দেখলাম।

তাড়োবা হ্রদ এবং আন্ধেরি নদীর অববাহিকা বলেই তাড়োবা টাইগার রিজার্ভ নাম। তাড়োবার হ্রদের জলে তার চারদিকের বন নানা রংয়ের ছোঁয়া লাগায়, ছায়া ফেলে। তাদের নিজেদের গায়ের রং। বর্ষায় তা গাঢ় সবুজ, বসন্তে লাল হলুদ, গ্রীষ্মে তাপসের পাটকিলে, নয় সাদা।

নাগপুর থেকে তাড়োবা আসতে হলে চম্পা হয়ে আম্বা নদীর ব্রিজ পেরিয়ে এসে উমরের ভিওয়াপুর এবং হারু নদী পেরিয়ে জ্যম্বুলঘাটা ও চিমুকু হয়ে ১৬-১৭ কিমি এসে বাঁদিকে ঢুকতে হয়। উমরের একটি বড় জনপদ। এ ছাড়া তেমন জনপদ নেই নাগপুর আর তাড়োবার মধ্যে চন্দ্রপুর (যাকে গোন্দ রাজাদের আমলে বলত চান্দা) হয়ে তাড়োবা আসতে হলে চিমুর ছাড়িয়ে সোজা চলে আসতে হবে মোহার্লিতে। চেক পোস্ট ও সুন্দর

ইনফরমেশন সেন্টার আছে মোহার্লিতে। ডিএফও নীতিন কাকোড়কারের তত্ত্বাবধানে বানানো। তাড়োবা থেকে যদি চন্দ্রপুরা হয়ে কেউ নাগপুরে আসতে চান তা হলে এই মোহার্লি গেট পেরিয়েই চন্দ্রপুরা এসে ওয়াবারো, ঝুটবরি হয়ে নাগপুরে আসতে হবে। মোহার্লি গেট চন্দ্রপুরার কাছে পড়ে। চিমুর হয়ে ঢুকলে ঘুরতে কম হয় কিন্তু এখন অনেকদিন পথ বেশ খারাপ আছে। কোয়ালিস গাড়িতে বসেও যখন খারাপ মনে হল তখন সত্যিই বেশ খারাপ। তবে মোহার্লি থেকে চন্দ্রপুরার পথের কিছুটা খারাপ তবে বেশি দূর যেতে হয় না সেই খারাপ পথে। বলেইছি তো, আমরা শেষ বিকেলে গিয়ে পৌঁছলাম তাড়োবাতে। পৌঁছে, একজন গার্ডকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম সার্কেলে চক্কর দিতে। তাড়োবাতে সন্ধে সাতটার পরে গাড়ি চলাচল মানা। তবে প্রদীপ গাঙ্গুলি কনসার্ভেটরের গেস্ট তাকে 'না' বলে কেডায়? আমরা যখন গেছিলাম তখন যদিও নীতিন ছিলেন না।

সেই সন্ধেতে বেরিয়ে সম্বর, চিতল এবং বাইসন বা গাউর দেখলাম অনেক। পরের দু দিন এবং রাতে একদল বুনো কুকুর বা ঢোল দেখলাম, তারা একটা হোঁতকা এবং বিরাট দাঁতাল শুয়োরকে ধরতে চেষ্টা করে সেই দাঁতালের দাঁত এবং জেদের কারণে বিফলমনোরথ হয়ে ইতি-উতি ঘুরপাক খেতে লাগল। দাঁতাল তাদের ঝেড়ে ফেলে ঘোঁত ঘোঁত করে ছুটে চলে গেল। বাইরে থেকে দেখে তাকে অক্ষতই মনে হল কিন্তু আভ্যন্তরীণ আঘাত কী এবং কি তা নিয়ে আমরা মাথা খাটালাম না। দলবদ্ধ জংলি কুকুরদের আক্রমণ যে প্রতিহত করা যায় তা অভাবনীয়। এদের হাত থেকে সে পালিয়ে বাঁচে। প্রদীপ, সুদীপ্ত, সঞ্জীব এবং প্রদীপের দাদা গোরা সকলেই দেখলাম বনজঙ্গল ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং নানা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক। শুধুই তাস খেলতে বা মদ খেতে তারা জঙ্গলে যায় না, জঙ্গলকে জেনে, ভালবেসে যায়। খুবই ভাল লাগল ওদের দেখে।

বহু বছর পর বিদায়ী সূর্যর আলোতে একটা লেপার্ডকে জঙ্গলের সায়ান্ধকার পথ পেরুতে দেখলাম। খুব বড় নয়। তবে প্রাপ্তবয়স্ক বাঘের পায়ের দাগ দেখলাম। অনেকই জায়গায়। তবে সকালে বিকেলে এবং সন্ধেতে অনেক ঘোরাঘুরি করেও বাঘের দেখা পেলাম না। এ বছরই শীতে

একটি বাঘিনী তার চারটি বাচ্চাকে নিয়ে (এই তিন-চার মাস বয়সের বাচ্চা) এই বনে ছিল যে, তার ভিডিও ফিল্ম দেখলাম গেস্টহাউসের বসার ঘরে। ফিল্ম, নীতিন কাক্কোডকরেরেই তোলা। ভারতীয় বাইসন, নীলগাই, সম্বর, জাঙ্গল ক্যাট, চিতল, নাইট জার, ইয়ালোওয়াটেলড ল্যাপডইং দেখলাম প্রচুর।

এক দিন মোহার্লির ইনফরমেশান সেন্টার দেখতে গেলাম সকালে। ভারি সুন্দর ভাবে ভাবনা-চিন্তা করে করে এবং গোন্দদের নানা ঐতিহ্য জেনে ও মেনে সেন্টারের ভিতর ও বাইরের পরিকল্পনা করেছেন কাক্কোডকর সাহেব। পুরো সেন্টারটিকে একটি গোন্দ বালিকা যেন ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে আমাদের, বা দেখাবে অন্যদের, এমনি করেই তা বানানো হয়েছে। শুধু টাইগার রিজার্ভ বা বাফার জোনই নয়, বনের মধ্যে বসবাসকারী গোন্দ আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, সমাজ, চোরা শিকারি ও বনকে ভাল না-বাসা মানুষদের সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়েছে। খুবই সুন্দর লাগল। পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের অন্যত্র এবং আফ্রিকাতেও ইনফরমেশান সেন্টার দেখেছি বনে বনে অনেক কিন্তু এটি অনন্য। ডি.এফ.ও. নীতিন কাক্কোডকরকে একটি চিঠি লিখব কলকাতা ফিরে। অভিনন্দন জানিয়ে।

এখানের এই মহারাষ্ট্রের তাড়োবাতে জন্তুজানোয়ারদের চেহারা অন্যরকম। বহু স্থানের আলওয়ারের, সারিসকার বা বিহারের পালামৌর বা বাংলার বক্সার বা মধ্যপ্রদেশের কানহার বা আসামের কাজিরাঙ্গাতে একই বন্যপ্রাণীর চেহারা অন্যরকম। হাজারিবাগের নীলগাইদের চেহারা সত্যিই নীলচে। অনেক জায়গাতে নীলগাই হঠাৎ দেখলে সম্বর বলে ভুল হয়। তাড়োবার নীলগাই ও সম্বর এবং বাইসন (গাউর) বিশেষ করে অল্পবয়স যাদের, চেহারার বেশ মিল আছে।

এখানে অনেক লোহার খাঁচা আছে, হাইড আউট, সল্ট লিক বা নুনি। ন্যাচারাল বা আর্টিফিসিয়াল, কুদরতি অথবা বানাওটি, আছে। পশ্চিমবঙ্গের মহানন্দা স্যাংচুয়ারিতে যে একটা হাইড-আউট দেখেছিলাম NATURAL SALT LICK-এর ওপরে, তার মতো সুন্দর ও গভীর বনাবৃত হাইড-আউট কমই দেখেছি। বন তো গভীর হবেই। হিমালয়ের পাদদেশের মিশ্র জঙ্গলের সঙ্গে

রুখু মহারাষ্ট্রের তাড়োবার মিল হবেই বা কী করে! তাড়োবার সবচেয়ে দ্রষ্টব্য জিনিস ভূত-গাছ বা GHOST-TREE, KARU-GUM গাছ। এমন অদ্ভুত গাছ পৃথিবীর কোথাও দেখিনি। আশ্চর্য সাদা রঙের কাণ্ড ও ডালপালা সেই গাছগুলোর। রাতের বেলায় বিশেষ করে অন্ধকার রাতে দেখলে ভূত বলে মনে হতেই পারে যদিও ভূত মাত্রই যে সাহেবদের মতো ফর্সা হবেই তার কোনও মানে নেই। আমাদের বাংলার কাঁড়িয়া পিরেতও তো ভূত। নয় কি?

কারু গাছের বটানিকাল নাম STERCULA URENS. GHOST OF THE FOREST-ও বলেন অনেকে। এই কারু গাছের আঠা অনেক ওষুধ-বিষুধ বানাতে কাজে লাগে। এই সময় এই গাছে একটাও পাতা নেই। ধবধবে অতিপ্রাকৃত কাণ্ড ও ডালপালা নিয়ে তারা সত্যিই ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বনের ভিতরে। দুর্বল হৃদয়ের মানুষ হঠাৎ দেখে অক্কাও পেতে পারে। এই সব বন মুখ্যত সেগুন আর বাঁশের। বাঁশ গাছে ফুল এলেই তার মৃত্যুর ঘণ্টা বাজে। এই সব অঞ্চলে 1982-83-তে সমস্ত বাঁশ গাছে ফুল এসে সব গাছ মরে যায়। এখন যে গাছ আমরা দেখছি সেই সব পুরনো বাঁশ গাছের বীজ থেকে হওয়া নতুন বাঁশ গাছ। এখানের বাঁশ মোটা হয় না পশ্চিমবঙ্গ বা আসামের বাঁশের মতো। এই রকম গাছ অমরকণ্টকের নীচের জঙ্গলে, বিশেষ করে অচানকমার স্যাংচুয়ারিতে দেখতে পাওয়া যায়। তোমার বড়মামা যেখান থেকে এনে তোমাদের শান্তিনিকেতনের মামাবাড়িতে লাগিয়েছিলেন। গোন্দ রাজাদের বানানো পথপাশের কালচে-লাল পাথরের স্তম্ভগুলো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই স্তম্ভগুলোর [illegible]ংটা থেকে দড়ি বা তার ঝোলানো থাকত—সেই ঘণ্টা বাজিয়ে [illegible]ানী চান্দা পর্যন্ত খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া করতেন ওঁরা। টেলিফোন আর কী!

ইচ্ছে আছে, এই গোন্দ রাজাদের সম্বন্ধে একটু পড়াশুনো করে কখনও লিখব কিছু। অচানকমারের গোন্দদের নিয়ে যেমন লিখেছি 'অদল-বদল' উপন্যাসে।

কানহারই মতো তাড়োবা থেকেও গ্রাম তুলে নিয়ে ন্যাশনাল পার্ক-এর বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানে দুটি গ্রামের গ্রামবাসীদের বের করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য অন্যত্র তাদের বসবাসের বন্দোবস্তও করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের কান্‌হার, ধুধা নাইগাদের মতো এই মহারাষ্ট্রেরও কত গোন্দ গ্রাম হারিয়ে গেছে, যেমন হারিয়ে গেছে আমাদের গ্রাম, শহর, অধুনা বাংলাদেশে। আমাদের সেই শহর গ্রাম থাকলেও তাতে আমাদের আর কোনও অধিকার নেই, ফিরে তাকাবার উপায়ও নেই। তাই যখনই কোনও উৎখাত হওয়া গ্রামের কাছে আমি যাই তখনই বুকের মধ্যেটা টনটন করে ওঠে।

মোহালি থেকে অল্প দূরেই কোসলা বলে একটি জায়গা আছে, যেখানে বনবাংলোও আছে। কোসলা। তবে আমরা যেখানে আছি সেটি ভিআইপিদের জন্য সংরক্ষিত বাংলো। এখানে সন্ধে ছটা থেকে সকাল ছটা, অনেক বনপথেই লুকোনো ক্যামেরা ফিট করা থাকে। পথের ধুলোর নিচ দিয়ে বিছিয়ে রাখা হয়। সে পথ দিয়ে যেই যাক না কেন শিকারি বাঘ কী চোরা শিকারি, তার ছবি উঠে যায় INSTANT CAMERA-তে। পরদিন ভোরে বনবিভাগের কর্মীরা সেই ক্যামেরার ফিল্ম নিয়ে এসে ডেভালাপ করে দেখেন। অনেক জায়গায় FLASH GUN-ও জ্বলে ওঠে মুহূর্তের জন্যে। তবে ধুরন্ধর চোরা শিকারিরা সেই ক্যামেরাই কখনও কখনও নিয়ে যায়।

চিঠিটি ইনফরমেশানে ভরপুর হল যদিও কিন্তু সহজপাঠ্য হল না বোধহয়। রোমান্টিক তো নয়ই।

ইতি তোমার ডাহুকদাদা,

যে এখন অন্য বনে।





৬

—তুমি কোথায়?

কুমুদিনীর ফোনের রিংটোন বাজা শেষ হলে তার গলা শোনা গেল। যেন অপ্সরার গলা, যেন অন্য কোনও গ্রহ থেকে বলছে, আধো-আধো, আদুরে আদুরে। নব্য ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয় খুবই সেক্সি গলা, রানি মুখার্জির গলার মতো।

কুমুদিনী বলল, বলুন। কবে ফিরলেন নাগপুর থেকে, মানে আন্ধেরি তাড়োবা থেকে?

—এই তো, আজই দুপুরে। সকালে ভীষণ কুয়াশা থাকে এখন তাই নাগপুর এয়ারপোর্টে বসে বসে শ্রান্ত হয়ে গেলাম। বসে বসে ভাবছিলাম, কখন কলকাতা ফিরব, কখন কথা বলব তোমার সঙ্গে কলকাতাতে।

—আহা! কতই ঢঙ করতে পারেন আপনি! আমার কথা ভেবে যেন ঘুম আসছিল না আপনার।

—সত্যিই আসছিল না ঘুম, লিটারালি। তবে ঘুম যখন আসে তখন যে স্বপ্নও আসে।

"যব নিদ আয়ে তো খোয়াব আয়ে
যব খোয়াব আয়ে তো তুম আয়ে

পর তুমহারি ইয়াদ মে
না নিদ আয়ে, না খোয়াব আয়ে।"

—মানে কী হল?

—মানে হল, যখন ঘুম আসে তখন স্বপ্নও আসে, যখন স্বপ্ন আসে তখন তুমি আস, আর তোমাকে যখন মনে করি, তখন না ঘুম আসে না স্বপ্ন আসে।

—বাঃ। কার লেখা শায়েরি শুনি?

—ঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত সারমার সালানীর।

—সত্যি আপনি কত্ত জানেন।

—অনেক তো জানতে চাইনি। স্বল্প কিছু জানতে চেয়েছিলাম।

—কত?

—এই ধরো, তোমার ঊরুসন্ধি কেমন দেখতে।

—আপনি ভীষণ অসভ্য।

—আমি যে সভ্য এমন দাবি তো কারও কাছেই করিনি। তবে আমাকে অশান্তিনিকেতনী বললেও বলতে পার, অসভ্য বোলো না কখনও। কারণ তোমরা অসভ্য বলে যা কিছুই জানো, তা জঙ্গলের বাসিন্দা বা শহুরে মানুষ যেই হোক, তাদের রূপ তোমরা জানো না। তারা তথাকথিত সভ্যদের চেয়ে অনেকই বেশি সভ্য।

তারপর ডাহুক বলল, আজ সন্ধেবেলায় তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি। তোমার মালিক কি বাড়িতে থাকবেন?

—আমি কি কারো পোষা বেড়ালনি? আমার কোনও মালিক নেই। আমি একবিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তা, উচ্চশিক্ষিতা, নিজস্ব শরীর-মন-সম্পন্না একজন নারী। কারও শেকলে বাঁধা নই আমি।

—হলটা কী? তোমার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কি কোনও ঝামেলা হয়েছে? সে তো আদর্শ স্বামী,

"ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি ভবজলধিরত্নং

স্মরগরলখণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম।"

তুমি চণ্ডীদাসের পীরিতির ডেফিনিশান জানো?

"জলের উপর স্থলের বসতি
তাহার উপর ঢেউ—
তাহার উপরে পীরিতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ।"

কুমুদিনী বলল, আপনার এতো জ্ঞানের জন্যেই আপনার কিছু হল না।

—এখনও তো সময় যায়নি। এখনও হতে পারে। তা ছাড়া অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখন যে ঘাটে এসে ভিড়িয়েছি নৌকো সেখান থেকে জীবনের এই অবেলাতে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরব বলে মনে হয় না। 'বাবা তারকনাথের সেবা লাগে মহাদেব-ব-ব-ব-ব' বলে হাঁক দিতে দিতে সাদা হাফপ্যাণ্ট আর সাদা গেঞ্জি পরে বুকে হেঁটে হেঁটে তোমার দরজাতে পৌঁছে যেদিন হত্যা দিয়ে পড়ে হাঁক ছাড়ব সেদিন পাড়া-প্রতিবেশী জমা হয়ে যাবে—সেদিন আমাকে গাল পেড়ো না।

—আপনি একটি আশ্চর্য মানুষ। True to your self হতে পারেন না? আপনার এত ভেক। আপনি একটি বহুরূপী।

—অ্যাই তো! আবার প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করতে হচ্ছে। ইন্দিরা দেবী সেই বিচিত্রবীর্য পুরুষকে এই রকম অনুযোগই করেছিলেন। উত্তরে প্রমথ চৌধুরি বলেছিলেন : "পৃথিবীতে True to oneself হবার প্রধান বিপদ হচ্ছে—অপর লোকে ভুল বোঝে। বহুরূপী মনে করে—একটিমাত্র pose অবলম্বন করে সেইটিই আর পাঁচজনের চোখের সামনে দিন রাত ধরে রাখতে পারলেই মানুষের চরিত্রটা সহজ সরল ঠেকে। অন্ততঃ আমার মতো লোকের পক্ষে তাই। আমাদের সরল নাম লাভ করতে হলে অসরল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আজকাল দিন পড়েছে এমনি যে আমাদের লোকে অযথারূপে মন্দ লোক মনে করলে, সহ্য হয় কিন্তু hypocrite মনে করলে কিছুতেই সহ্য হয় না। তবে আমাদের সকল চাঞ্চল্য, সকল চপলতার

মধ্যেও একটা সুনির্দিষ্ট জিনিস অবশ্যই আছে। সেটা ধরতে পারলেই আমাদের পুরো রকম ধরতে পারা যায়।"

—আপনি এত বেশি পড়াশুনো করেছেন যে তাতে আপনার চরিত্রটি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

—তুমি কোথায়? যেখানেই থাকো না কেন সন্ধ্যেবেলাতে বাড়িতে থেকো। তোমার জন্য একটি শাড়ি আর এক শিশি ফিরদৌস আতর নিয়ে আজ পৌঁছে যাচ্ছি।

—আমি কলকাতাতে নেই। ছুটি নিয়েছি সাতদিনের। আমি এখন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে।

কুমুদিনী বলল।

—সে কি? তুমি তো দেখছি পাঁকাল মাছ হয়েছ। ধরতে গেলেই কেবলই পিছলে চলে যাও। তা হলে আমিও কাল শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। শেষ যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তুমি জিন্‌স পরে এসেছিলে। লক্ষ্মীটি! জিন্‌স পরো না তুমি।

—কেন?

—জিন্‌স পরলেই তোমার উরুসন্ধি ভাস্বর হয়ে ওঠে। তোমার উরুসন্ধির রোমশ কাঠবেড়ালিতে জমিয়ে চুমু খেতে ইচ্ছে করে আমার। আমাকে কষ্ট দিয়ে কি তুমি আনন্দ পাও?

—আপনি একটি অসভ্য। আমি মোবাইল অফফ্ করে দিচ্ছি। শান্তিনিকেতনে এলেও আমি দেখা করবো না।

—দেখি, দেখা না দিয়ে, না দেখিয়ে, তুমি কী করে পালাও। শুনছ কুমদিনী?

কোনো শব্দ নেই। কুমুদিনী সত্যিই মোবাইল অফফ্ করে দিয়েছে।

ডাহুকের মুখে এক আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল।

ডাহুক না গেয়ে, গেয়ে উঠল—

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো, কেউ জানবে না, কেউ বলবে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি দেশ-বিদেশ কতই ঘুরি—
এবার বলো আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছলবে না"।



৭

একটু আগে অনেকক্ষণ ধরে খুব জোর বৃষ্টি হয়েছে। এখন বৃষ্টি থেমেছে। বাংলোর সামনের চাপ চাপ গাঢ় সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে কুসুমফুল পাহাড় থেকে নেমে-আসা মুসানি নদীর দিকে। বৃষ্টির পরে ভিজে পাখিরা ডানা ঝেড়ে ঝেড়ে ডানার জল ঝরাচ্ছে আর পুলকভরে শিহর তুলে ডাকছে।

ঝিকরিপানির বন-বাংলোর পেছনের বারান্দাতে বসেছিল ডাহুক দত্ত। আষাঢ়ের সকালের ওই নদীপারের সব শব্দ গন্ধ রূপ রস বুকের মধ্যে নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে ডাহুক। দিব্যেন্দু পালিতের একটি উপন্যাস আছে, যার নাম 'বৃষ্টির পরে'। একটি অসাধারণ উপন্যাস। সম্ভবত বছর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ আগে কোনও কাগজের কোনও বিশেষ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল। বৃষ্টির পরের ওই ঘোর লাগা সকালে সেই উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে গেল ডাহুকের।

'নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি' রবীন্দ্রসঙ্গীতটি শুনেছিল বহু যুগ আগে সুনীল রায়ের গলাতে। ভৈরবীর এমন প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের খুব কম

গানেই ঘটেছে। আর তেমনই সুরেলা গলা ছিল সুনীলদার।

'বহুযুগ' শব্দটা ব্যবহার করার হক্ জন্মে গেছে এখন ডাহুকের। সেও এখন বহুযুগের পুরনো মানুষ। পোড়-খাওয়া তার চোখের সামনে দিয়ে দেখতে দেখতে তারই আঁজলা গলে তার যৌবন কোনও জলীয় পদার্থরই মতো তার নিজেরই পায়ের কাছে ঝরে পড়েছে ঝরঝরিয়ে। তাকে ও আটকাতে পারেনি, আটকাবার চেষ্টাও করেনি। ওর এক উত্তরপ্রদেশীয় বন্ধু একবার বলেছিল, "যৌওন যব আতি হ্যায়, বহতই সাঁতাতি হ্যায়। ঔর যব যাতি হ্যায়, তব ঔরভি জাদা সাঁতাতি হ্যায়।" কথাটার সত্য এবং সেই সত্যর নিমমতা আজ অনুভব করতে পারে ডাহুক। নিজের অনবধানে জীবনের বেলা পড়ে এসেছে। ছায়ারা দীর্ঘ হয়েছে। এক সময়ের নবীন হৃদয়ের নবীন শাখায় বসে গান গাওয়া সকালবেলার পাখিরা আজ বেলা শেষের গান গাইছে। কী পেয়েছে আর কী পায়নি তার হিসাব মিলাবার ইচ্ছাটুকুও আজ হারিয়ে গেছে। চলে যাবার আগে এই সুগন্ধি, সুন্দরী পৃথিবীকে যেন আরও বেশি করে ভালবাসতে চাইছে মন। বিধাতার অনবদ্য সৃষ্টি পাখি, প্রজাপতি, নারীকে যেন নতুনতর রূপে চিনতে পারছে। রবীন্দ্রনাথের 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা' গানটির মর্মকথা যেন জীবনের এই সাঁঝবেলাতে এসে হৃদয়ঙ্গম করছে।

দিব্যেন্দু পালিতের আর একটা অসাধারণ উপন্যাসের কথাও হঠাৎই মনে পড়ে গেল ডাহুকের। উপন্যাসটির নাম 'ভেবেছিলাম'। এই মিতলেখ ঔপন্যাসিক তেমন জনপ্রিয়তা পেলেন না অতি অল্প বয়স থেকে লেখালিখি শুরু করেও। এটা ভাবলে কষ্ট হয়, পাঠককুলের উপরে অভিমান হয়। দিব্যেন্দুর সঙ্গে একজন কবির নামও মনে হয়, যিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের খুবই বন্ধু ছিলেন, তিনি অমিতাভ দাশগুপ্ত। অথচ তাঁর যতখানি সম্মান ও যশ প্রাপ্য ছিল তার তুলনাতে কমই তিনি পেয়েছেন। সকলের যশভাগ্যর সঙ্গে যোগ্যতার সাযুজ্য থাকে না। এটা দুর্ভাগ্যজনক। জীবনের শেষে পৌঁছে এমন এমন সব সত্যর উপলব্ধি হয়, যা যৌবনে শত চেষ্টাতেও হয় না।

ঠিক সেই সময়েই একটি ক্রো-ফেজেন্ট, যাকে এখানের মানুষেরা বলে 'বন-কাওয়া' তার বাদামি-কালো বৃষ্টিভেজা শরীরটার গন্ধ ছড়িয়ে উড়ে

বসল সামনের বটল-ব্রাশ গাছের ডালে। এ পাখি সচরাচর গাছে বসে না, জমিতেই তার রাজত্ব। কেন বসল, কে জানে! আর পাখিটা এসে সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বসতেই তার কথা মনে পড়ে গেল ডাহুকের। তার একটা নাম অবশ্যই আছে কিন্তু সেই নাম আসল উচ্চারণ করলে সকলেই তাকে চিনে ফেলবে। কী বিপদ! জীবনের এই শেষ বিকেলে পৌঁছে সকালবেলায় কোনও দূতীকে ভালবেসে ফেলা যে ভীষণই অপরাধ।

বাঘবন্দীর ঘর এই জীবন আমাদের।—এই মিথ্যে দাম্পত্য, বিবাহিত জীবনের এই ম্যাড়মেড়ে অভ্যেস। সকলেরই। ডাহুকের জীবনেও দাম্পত্য ছিল। একসময়ে স্ত্রীও ছিল। ডাহুক প্রাণপণে অন্য দশজন বিবাহিত মানুষের মতো ঘর-সংসার ও স্ত্রী নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল কিন্তু তার কপালে সুখ সইল না। অনেকের জীবনেই ভালবাসা নেই, চমক নেই কোনও। এখানে ঘুঘু ডাকে না, শুধু চিল-চিৎকার করে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা দিয়ে। তবু সমাজের ভয়ে, লোকভয়ের ভয়ে এবং নিছকই সে ভালোমানুষ বলেই অন্যকে কষ্ট দিতে পারেনি বলেই, যাবতীয় কষ্ট নিজের বুকে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়েছে। এই করে করে নিজে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে। জীবনানন্দ দাশ-এর 'মাল্যবান' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। ডাহুকের ঘরণী সাহিত্য-টাহিত্য পড়েন না, পড়েননি কোনও দিনও। তাই ডাহুক দত্ত সংসারে শুধুই একটা অর্থোপার্জনের যন্ত্র ছিল। সে উদাসী কিন্তু তার ঘরণী পরম বিষয়ী, বস্তুতান্ত্রিক, ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট-এ বিশ্বাসী। তাই মনে মনে ডাহুক বহুদিনই হলো একা, একেবারেই একা হয়ে গেছে। ভাগ্যিস সে সাহিত্য পড়ে, সামান্য হলেও সাহিত্য করেও, গান শোনে, চানঘরে গান গায়, একা ঘরে ছবি আঁকে আর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে। কবে মৃত্যু হেনে তার এই হতভাগ্য, অভিশপ্ত জীবনের খাঁচা থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি দেবেন ঈশ্বর সেই দিন গোনে। শান্তি, তাকে একমাত্র মৃত্যুই দিতে পারে। সেই চিরঘুমে কেউই বিঘ্ন ঘটাবে না। সেই একটি শায়েরী আছে না? "অব তো শোনে দো চয়নসে, পড়ো না তলকিঁ, লহদসে যাও।" মানে, আমাকে কবরে ঘুমোতে দাও, এখানে তলকিঁও পোড়ো না, আমাকে একা থাকতে দাও, কবরস্থান থেকে সরে যাও। এইভাবে চলতে চলতে কখন যে

এই মিথ্যে চলাকে ও থামিয়ে দিয়েছিল তা নিজেই জানে না। যা থাকার নয়, তা না.থাকাই ভাল। ডাহুকের স্ত্রী পারমিতা তাকে খুবই ভালবাসত। অনেক কিছু করত তার জন্যে, কিন্তু সে-সবের কিছুতেই ডাহুকের প্রয়োজন ছিল না বিন্দুমাত্র। একথাটা পারমিতাকে বোঝাতে পারেনি ডাহুক কোনোদিনও। শেষে ডিভোর্স করে দুজনেই মুক্ত হয়েছে। আদিবাসী দম্পতির মতো। মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু কোনো তিক্ততা নেই, কিছুমাত্রই নয়।

ডাহুকের মনটা তার জীবনে নতুন-আসা সেই নারীর জন্যে বড় উতলা হয়ে উঠল। সমরেশ বসুর একটি উপন্যাস নিয়ে ছবি হয়েছিল, উত্তমকুমার তাতে অভিনয় করেছিলেন, নাম ছিল ছবির 'বিকেলে ভোরের ফুল'। ছবিটির কথা মনে পড়ে গেল। বারান্দার সাইড-টেবলে রাখা মোবাইল ফোনটা তুলে নিয়ে ডাহুক তার নম্বরটা ডায়াল করল। তার গলার স্বরটি ভীষণই যৌনতামাখা, তার চেহারাটিও এমন যে হাজারজনের মধ্যে চোখে পড়ে। সে বড় সম্ভ্রান্ত, ভারি উজ্জ্বল তার ত্বক, ভারি আকর্ষণীয় তার বাচনভঙ্গি। আর ব্যবহারও অতি মধুর। মেয়েরা যদি কর্কশ হয়, কোমল না হয়, তবে বিপন্ন বোধ করে ডাহুক। সেই কর্কশতা তার মনের সব মাধুর্যকে মাড়িয়ে দিয়ে পদ্মবনে মত্ত হাতির মতো লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায় তার মনকে। আর তার মনটা যে বড় নরম, ঘুঘুর বুকের মতো, আর পাতলাও, ফড়িঙের ডানারই মতো। জোর হাওয়া লাগলেই সেই মনে ব্যথা লাগে, তা ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়। গুলি-খাওয়া পাখির মতো সে তরুতলে পড়ে থাকে, জীবনের তরুতলে। একসময়ে গুলি করে তো পাখিও মেরেছে ডাহুক। বড় নিষ্ঠুর ছিল সে যৌবনে। কত যে অন্যায় করেছে। আজ বোঝে। যৌবনের ভুল পরিণত বয়সে এসে বোঝা যায় কিন্তু তার স্খলন তো হয় না। শুধু অনুতাপ পড়ে থাকে।

ফোনটা বাজছিল। ওর মোবাইলে কোনও বোকা-বোকা ইংরেজি বা বাংলা গান বাজে না। এমনই রিং-টোন।

ওপাশ থেকে ওর গলা ভেসে এল। বলুন।

তুমি কোথায়?

আমি রাস্তাতে। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরছি। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি!

মেয়েটা ভিজে একসা হয়েছে। গাড়ির মধ্যেই তাকে চেঞ্জ করাচ্ছি।

গাড়ি কে চালাচ্ছে। তোমার স্বামী?

না, না। সে তো এখন বাঙ্গালোরে। অফিসের কাজে গেছে। আমার অফিসের ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে—গাড়িও তো অফিসেরই।

তুমিও কি কাজে গেছিলে?

কাজও ছিল। তবে সামান্য। অকাজেই এসেছিলাম। মাত্র দু'দিনের জন্যে। মায়ের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। আসলে মাকেই দেখতে এসেছিলাম, কাজের বাহানাতে। শান্তিনিকেতনের বর্ষাকালটা আমার খুব প্রিয়। খোয়াই, কোপাই, ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়।

—তুমি কেমন আছ কুমুদিনী?

তার আসল নামে যে ডাকা মানা, তাই তারই প্রিয় নামে ডাকে ডাহুক।

—ভাল। খুব ভাল। আর আপনি?

—আমি তো ভাল থাকি না। এই তোমার সঙ্গে যখন কথা বলি তখনই একটু ভাল থাকি।

—আপনি খুব সুন্দর করে কথা বলেন।

—সুন্দর করে আর কিছুই তো করতে পারলাম না জীবনে। শুধু কথাই বলতে পারি। কিন্তু আমার কথার খেপলা জালে কোনও মাছই তো ওঠেনি জীবনে। শুধু শুধু জীবনের নদী পারে বৃষ্টিতে ভেজাই সার হল।

—আপনি এখন কোথায়?

—নাম শুনলে বলবে, ঈস্‌স্‌ অমন জায়গাতে একা গেলেন? আমাকে নিয়ে গেলেন না?

—জায়গাটার নাম ঝিকারিপানি। বনের যা নাম, বন-বাংলোর নামও তাই। কুসুমফুল পাহাড় উঠে গেছে সামনে—বর্ষাকালে বটল-গ্রিন তার রঙ, ব্যাসাল্ট আর কোয়ার্টজাইট পাথরের মাঝে মাঝে বর্ষার গাঢ় সবুজের ছোপ লেগেছে। বৃষ্টি শেষের ফিকে-রঙা আকাশ।

—ঈসস। খুব লোভ হচ্ছে। যদি যেতে পারতাম আপনার সঙ্গে!

—সত্যি বলছ? সত্যিই আসতে, বললে, পারতে আসতে একা আমার সঙ্গে? স্বামী? তোমার কন্যা এবং কাজ ছেড়ে? অবশ্য তুমি যদি হ্যাঁ বলতে

তাহলে আমি হয়তো বেঁকে বসতাম।

—কেন?

—আমারও বুঝি পিছুটান নেই? তারপরে সমাজ আছে না? তীক্ষ্ণ চঞ্চু কুটিল বাজ পাখি। সে বাজও নয়, শকুন। সমাজ সংসারের বাঘবন্দী ঘরের বাইরে কারও একটু আনন্দ দেখলেই হামলে পড়ে ঠোঁটে নখে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে আমাকে শেষ করে দেবে।

—সেটা ঠিক।

—অথচ তুমি আর আমি কিন্তু অনায়াসেই আসতে পারতাম।

—এ কথা বলছেন কেন?

—তোমার গ্রীবাতে বা স্তনসন্ধিতে একটি দুটি আলতো চুমু, তোমার চানঘরের টিকটিকি হয়ে তোমার চান দেখা, এই-ই তো সব।

—আপনি একটা যা-তা।

—এতদিনে সেটা বুঝলে!

—উপন্যাস লিখতে গেছেন কি?

—উপন্যাসই, তবে সে উপন্যাস কোনও পুজোসংখ্যাতে লিখব না। বড় উপন্যাস হবে তো। কোথাও লিখব হয়তো ধারাবাহিক। নইলে, এমনিই সরাসরি লিখে প্রকাশককে দেব।

—নাম কী দেবেন?

—কুমুদিনী। তাই তো কথা ছিল।

—কেউ যেন বুঝতে না পারে।

কুমুদিনী গলা নামিয়ে বলল।

—না। শুধু তুমি বুঝবে আর আমি।

—হুঁ। মনে থাকে যেন। নইলে ভীষণই অশান্তি হবে। আপনি তো আমার স্বামীকে জানেন। সবই ভাল কিন্তু বড্ড পজেসিভ।

—যেদিন পজেসিভ থাকবে না, সেদিন জানবে যে, সে তোমাকে আর ভালবাসে না।

—তাই?

—তাই।

—সত্যি! আপনি কত্ত জানেন। তাই তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে এত ভাল লাগে।

—তাই বুঝি।

—বলেই বললাম, আমার মোবাইলের চার্জ ফুরিয়ে এসেছে।

—তাই এরকম ডিসটার্বেন্স হচ্ছে।

—চার্জারটা দিতে ভুলে গেছে আমার বেয়ারা। কখনও ভোলে না। কলকাতা গিয়ে আবার কথা বলব। তুমিও তো করতে পারো কখনও।

—আপনিই করবেন।

—করলে তো তুমি বিরক্ত হও।

—একটুও হই না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার খুব ভাল লাগে।

—আমাকে খুশি করার জন্যে বলছ একথা।

—আমি কারোকে খুশি করার জন্য কিছু করি না, নিজের খুশির জন্যই করি যা কিছু।

—তুমি বড় ভাগ্যবতী।

এবারে ডাহুকের মোবাইলের চার্জটা সত্যিই শেষ হয়ে গেল।

—এমন সময়ে চৌকিদার এসে বলল, নাস্তা লাগা দেগা হুজৌর টেবলমে? বন গ্যয়া।

ডাহুক বলল, হিঁয়াই লাও না!

—হিঁয়া? ঠিক হ্যায়। লাতা হ্যায়।

—ডাহুক কুসুমফুল পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইল। পাহাড়ে জোর বৃষ্টি হওয়াতে মুসানি নদীতে ঢল নেমেছে। কলরোলে জল চলেছে। জল এখন কজওয়ের উপর দিয়ে বইছে। পথের উপরে প্রায় এক হাঁটু প্রবল বেগে বয়ে যাওয়া জল। গাড়ি ভাসিয়ে নিতে পারে কোনও অনভিজ্ঞ চালক যদি পথ পেরুতে যায় তখন। আকাশে আবার নতুন মেঘপুঞ্জ জমেছে। আবার বৃষ্টি হবে। পাখির ডাক, গাছেদের, ঘাসের, ফুলপাতার, সোঁদা মাটির গন্ধ বয়ে হাওয়াটা ল্যাব্রাডর গান ডগ এর মতো ছোটাছুটি করছে বনে বনে। ভারি

ভাল লাগছে ডাহুকের ওর সঙ্গে কথা বলার পরে। ওর মধ্যে একধরনের গভীরতা আছে যা একালের কম মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়। একদিন ওকে জিগগেস করেছিল, তুমি নিজে নিজের নাম রাখলে কী নাম রাখতে?

—ও বলেছিল, আমার রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের নাম খুব ভাল লাগে। রাখতাম, কুমুদিনী। কিন্তু কেন এ কথা জিগগেস করছেন?

—ডাহুক বলেছিল, তোমাকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখব। বড় উপন্যাস এবং হয়তো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তার নাম দেব কুমুদিনী। একজন লেখক এই নৈবেদ্য ছাড়া আর কিই বা দিতে পারে? যাকে সে ভালবাসে, তাকে?

—কাকে উৎসর্গ করবেন?

—কেন? তোমাকে!

—এই রে। তাহলে সকলে ধরে ফেলবে।

—বেশ। তাহলে উৎসর্গ করব কুমুদিনীকেই। কেউ বুঝতেই পারবে না।

—তাই?

সেদিনের পর থেকেই কুমুদিনী কথা হলেই জিজ্ঞেস করে ডাহুককে, উপন্যাস কতদূর এগুলো?

—ওকে না বলে নিজের মনেই ডাহুক বলে, এগোচ্ছে। সুন্দর প্রতিমা কি তাড়াহুড়ো করে গড়া যায়? আগে অনেক যত্ন করে খড় করতে হবে, তারপরে তাতে মাটি দিতে হবে, তারও পরে চোখ চিবুক মুখ, তার পরে রঙ লাগাতে হবে তুলি দিয়ে, তারও পরে গর্জন তেল। তারপরে ডাহুক বলে, তোমাকে কি আমি যা-তা করে গড়তে পারি? আমি যে তোমাকে ভালবাসি। 'ভালবাসি, ভালবাসি, সেই সুরে কাছে দূরে বাজায় বাঁশি।'



৮

কুমুদিনীর মোবাইল এর রিং-টোন বেজে যাচ্ছিল। কুমুদিনী বলল, বলুন।

ডাহুক বলল, তুমি কোথায়।

—দু'দিনের ছুটি ছিল, তাই দিঘাতে এসেছি।

—সঙ্গে স্বামী যায়নি?

—না।

—কেন না?

—ও ওর বন্ধুদের সঙ্গে গড় পঞ্চকোটে গেছে। বন বিভাগ চমৎকার বাংলো বানিয়েছেন সম্প্রতি যেখানে। অন্তত আমাকে তাই বলে গেছে।

—চমৎকার জায়গা তো, তুমি গেলে না কেন?

—ওর অধিকাংশ বন্ধু আর তাঁদের স্ত্রীদের আমার ভাল লাগে না।

—কেন লাগে না?

—লাগে না। ওরা শুধু শপিং মল, আর হিন্দী ছবি আর টাকার গল্প করে। আকণ্ঠ রাম্ আর জিন খায়। বেলেল্লাপনা করে।

—সে তো তুমিও খাও মাঝে মধ্যে। আমিও তো খাই। ওসব খেলেই কি মানুষ খারাপ হয়ে যায়?

—যারা খারাপ তারা আগে থেকেই খারাপ থাকে। ওসব খেলে সেই

খারাপত্ব বাড়ে, এই যা। আসলে ওরা বড় সাধারণ। আমার সাধারণদের ভাল লাগে না।

—ডাহুক বলল, আমারও তাই। তাই তো তোমাকে এত ভাল লাগে আমার। সকলেই যা করে তা করতে আমার কোনোদিনই ভাল লাগেনি।

—আমারও।

—তাই তো আমারও আপনাকে ভাল লাগে। ওদের দেখে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে প্রশ্বাস নেওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলার জন্যেই ওরা এসেছিল ওই পৃথিবীতে। ওরা টাকা বোঝে, গাড়ি বোঝে, ভাল ফ্ল্যাট বোঝে, ভাল ফার্নিচার, দামি জামা কাপড়। ওদের মানসিকতার সঙ্গে আমার মানসিকতা একেবারেই মেলে না। যাদের রুচি ভাল নয়, তাদের কাছে ওই আর্থিক সাচ্ছল্য শিশুর হাতে গুলিভরা পিস্তলেরই মতো।

—স্বামীরও কি ওরকম?

—হ্যাঁ। ও-ও। ওর এক বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে ওর একটু মাখো মাখো ভাব হয়েছে। একটু নয়, বেশ বেশিই।

—কতদিন?

—এই কিছুদিন হলো।

—তা তো হতেই পারে। সে জন্যে তোমার রাগ করা উচিত নয়। নিজের SPOUSE ছাড়া অন্য কারোকে ভাল লাগা তো কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। এ তো চিরদিনই ঘটে আসছে।

—রাগ তো করি না। মেয়েটির মধ্যে যদি একটুও সূক্ষ্মতা ও গভীরতা থাকত তবে রাগ করতাম না। স্বামী কিন্তু বিয়ের সময়ে এরকম ছিল না। খুব ভাল আবৃত্তি করত। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অতুলপ্রসাদের গান গাইত, সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক ছিল, ইংরেজি এবং বাংলা সাহিত্যেরও। এখন ও ওর অফিসের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশে একেবারে বদলে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে বোধহয় আমি চিনিই না। মানে, ও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। জানি না, টি-ভি চ্যানেল বা অ্যাড এজেন্সিতে কাজ করলে সব মানুষই এমন তরল হয়ে যায় কী না। তবে

পৃথ্বী যে তরল হয়েছে সে বিষয় কোনো সন্দেহই নেই। তারল্য ওকে গ্রাস করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সারল্য যা ওর FORTE ছিল, সেটিও চলে গেছে। তাই ঝগড়া না করে সরে এসেছি মনে মনে।

ডাহুক বলল, এরকম সরলীকরণ করা কি ভাল? টি-ভি চ্যানেল আর অ্যাড এজেন্সিতে কাজ করার সঙ্গে তারল্যর কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না আমার। তাছাড়া সকলকেই যে রবীন্দ্রনাথ আর অতুলপ্রসাদ শুনতে হবে বা গাইতে হবে তার কী মানে আছে। তাদের যদি ব্যান্ড ভাল লাগে তো তাই শুনবে। 'কলিং-এর ঘণ্টা শুনে', বারান্দায় রোদ্দুর, ভূমি, ক্যাকটাস, দোহার, মাদল মন্দ কী। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা একটা নতুন এক্সপ্রেশনের পথ খুঁজে পেয়েছে। ওরা তাতে হোকই না খুশি। কোনোদিন ওরা যদি ফিরে আসে তো নিজে থেকেই ফিরে আসবে। তাছাড়া তোমরাও তো ওদের দলে ভিড়ে যেতে পারো। তাতে দোষের কী? অ্যাডমিক্সচার অফ টু কালচারস ইজ অলওয়েজ ওয়েলকাম।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কুমুদিনী বলল, জানেন ডাহুকদা মাঝে মাঝে ভয় হয় যে, হয়তো আমাদের ছাড়াছাড়িই হয়ে যাবে। এমন যে হবে তা আগে জানলে পুঁচকিকে আমি পৃথিবীতে আনতামই না। জানি, এখনও অনেক দিন পুঁচকির মন চেয়েই এই সম্পর্ককে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

—সংসারে আগে কি সব জানা যায়। জীবন এরকমই। চলতে চলতেই জানতে হয়, খুব কম জানারই অগ্রিম প্রস্তুতি থাকে। তুমি বড় সহজে বিচলিত হও কুমু। আমিও তো তোমাকে ভালবাসি। এ কথা স্বামী কি একেবারেই বুঝতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। আমাদের ওই সম্পর্কের কারণে তারও তো নিরুচ্চারিত অভিমান থাকতে পারে। রাগ না করে তোমাকে উপেক্ষা করেই হয়ত সে তার মনোভাব প্রকাশ করে। সকলের ভাব প্রকাশের রকম তো এক নয়। তোমার প্রতি আমার যে এই অসময়ের দুর্বলতা তাতে এবং আমার সামাজিক অবস্থানে ও হয়তো হেরে যাওয়ার আশংকা করে, সমুদ্রের তটে ওড়াউড়ি করা টার্ন বা স্যান্ডপাইপার পাখিরা

যেমন সমুদ্রের ঢেউয়ের গন্ধ পায়, ঢেউয়ের রকম বোঝে, ঢেউ তটে আছড়ে পড়ার আগে থাকতেই।

—আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তো বায়বীয়। মোবাইলে প্রতিদিন কথা বললেই কি কোনো সম্পর্ক হয়? একে কি সম্পর্ক বলে? আপনি যা বললেন তাই যদি সত্যি হয় তবে বলতে হয় ভুল করে আমি এক বোকা মানুষকে ভালোবেসেছিলাম।

—সম্পর্কমাত্রই কি শারীরিক? আমাদের এই যে প্রাত্যাহিক কথাবার্তা এও কি প্রেম নয় একরকমের? প্রেমের ইমারত কি একদিনে গড়ে ওঠে? কত দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা, তিতিক্ষা, কল্পনা, বেদনা-বিলাস দিয়েই তো প্রকৃত প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে না তার ভিত দৃঢ় হয়। স্বামীর সঙ্গে তোমার প্রেম কি একদিনে হয়েছিল কিছু? ভেবে দেখো। কোনো খন্ডহর থেকে কোনো কিছু গড়ে তোলা সব সময়েই কঠিন। তাছাড়া ছাড়া তো অতি সোজা। ছাড়ার কথা মনেও এনো না। বিশেষ করে, পুঁচকির কথা ভেবে।

—ও যদি কোনো সুরুচিসম্পন্ন গভীর মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতো তাহলে আমার লাগত না। মেয়েটি একটি দেহসর্বস্বী, উৎকট সুন্দরী, কুশ্রী তার চলা-বলা, তার চোখের চাউনি, তার সাজ-পোশাক। আমি ঘেন্না করি তাকে।

—স্বামী যদি অন্য কারো প্রতিই আসক্ত হয়, সব স্ত্রীরাই সেই অন্য জনকে ঘেন্না করে। ঘেন্না করার জন্যে তার আর কোনো বিশেষ দোষের প্রয়োজন হয় না। ও নিয়ে তুমি মিছিমিছি এত আলোড়িত হয়ো না। তুমি তো বোকা নও। ছেড়ে দাও ওকে। ও নিজেই ফিরে আসবে তোমার কাছে। তোমার মনের লাটাই-এর সুতো ছাড়ো। ছাড়ার আগে সুতোর মাঞ্জাটার বয়স সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিও অবশ্যই। মাঞ্জাতে ঠিকমতো ধার যদি থাকেই তবে অন্য ঘুড়ি তো কাটা যাবেই।

—ভাবছেন আপনি। অদ্ভুত অদ্ভুত ফিলোজফিকাল কথা বলেন আপনি।

—না। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে, আসলে আমি অ্যাপ্লায়েড রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলি। তুমি বস্‌কে চাও না অথবা পাও না, তাই ভুল বোঝো।

—তাই বুঝি ভাবছেন আপনি?

—ভাবছিই তো এবং ঠিকই ভাবছি। দাম্পত্যর সুনীল আকাশে মাঝে মাঝে কালো মেঘ জমেই। সেই মেঘ উড়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হয়। স্বামী ছাড়াও তো তোমার একটা মস্ত ভুবনজোড়া আনন্দময় জীবন আছে, তোমার পুঁচকি আছে। চার পাঁচ বছর বয়স অবধি শিশুরা ঈশ্বর-ঈশ্বরী। তাদের ঠোঁটে তখনও দুধের গন্ধ, আর গায়ে বেবি জনসন পাউডারের গন্ধ, তাদের বুকে নিলে, চটকালে, চুমু খেলে, তার মা বা বাবা যা আনন্দ পায় তা অন্য কিছুতেই পায় না। এখানেই অপত্যর কাছে হেরে যায় প্রেম, অথবা স্ত্রী-পুরুষের সব শারীরিক সম্পর্কর আনন্দ, সুখী দাম্পত্যর সব সুখ। তোমার শিসের দুঃখ? ঈশ্বরীর মতো শিশু পুঁচকি যেমন সত্যিই আছে তোমার সমস্তটুকু জুড়ে তেমন করে হাত বাড়ালে এই বুড়ো-হাবড়া মানুষটিও তো আছে, যে তোমার প্রেমে কাতর, যে তোমাকে নিঃশর্তে ভালবাসে বদলে তুমি কিছু দাও আর নাই দাও।

—ও কথা সব পুরুষই বলে। পুরুষেরা প্রেম কাকে বলে তা জানেই না। ও বাবদে স্বামীর সঙ্গে আপনার কোনো তফাত নেই। পুরুষেরা মেয়েদের শরীর ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তারা বড় বোকা। আর তাইইত দেহসর্বস্বীরা চিরদিনই হারিয়ে দেয় আমার মতো সাদামাঠা সৌন্দর্যের গভীরতা গুণসম্পন্ন মেয়েদের।

—বাজে কথা। মেয়েদেরই মতো, পুরুষদের মধ্যেও নানা রকম হয়। সব পুরুষদেরই ও ভাবে নস্যাৎ করাটা উচিত নয়।

—জানি না। আজ অবধি কৈশোর থেকে যতজন পুরুষ দেখলাম, সকলেই ত একই রকম। স্বামীকে অন্যরকম ভেবেছিলাম। সেও তার অমন রূপ প্রকাশ করল বিয়ের ছ বছর পরে। আপনিও কিছু ব্যতিক্রম নন। হলে, আমার বুদ্ধি, আমার গানের গলা, আমার ব্যক্তিত্বর স্নিগ্ধতার

জন্যে আকুল না হয়ে আমার উরুসন্ধির রোমশ কাঠবিড়ালিকে নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি আপনি কখনওই করতে পারতেন না।

ডাহুক হাসল। বলল, কুমু, তোমার অনেক বুদ্ধি কিন্তু তুমি সব বোঝো না। অবশ্য বুঝবেই বা কী করে। তোমার বয়সই বা কী। জীবনের সমুদ্রে অনেক দূর সাঁতরে এসে, অনেক নীল, সবুজ, কালো, রুপোলি সোনালি ছোট-বড় ঢেউয়ে ভেসে ভেসে এসে এখন আমি যা বুঝি তুমি তা বুঝবে এমন সাধ্যই তোমার নেই। অথচ মানুষমাত্রেরই স্বভাবটি এমন যে সে কখনও অন্যের অভিজ্ঞতা কাজে লাগায় না ফলে তাকেও নানা ঢেউয়ের রদ্দা খেতে খেতে সাঁতার কাটতে কাটতে জীবনের সমুদ্রে এগোতে হয়। শেষে পৌঁছে আমারই মতো বুঝতে হয় যে কূলে পৌঁছনো হয়নি। সমুদ্র, পুকুর বা সুইমিং-পুল নয়। সমুদ্র সত্যিই অকূল। জীবনেরই মতো।

একটু চুপ করে থেকে বলল, তাছাড়া, তোমার উরুসন্ধি তো তোমারই শরীরের একটি অংশ। তোমার শ্রী-অঙ্গ। তার প্রতি তোমার বিরূপতা কেন?

—আপনি বড় লেখক, ভালো কথক, কথার মারপ্যাঁচে আপনি আমাকে সবসময়েই হারিয়ে দেন কিন্তু শুধু কথা দিয়ে বা কথার কথা দিয়ে তো জীবন ভরে না। আমি যা বললাম একটু আগে তার জবাবটা আপনি এড়িয়ে গেলেন।

—কোথায় এড়ালাম। আমি যা বললাম তা কি তুমি বুঝতে পারলে না? জীবনকে, নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সুন্দর করে তুলতে মনের গভীরতা যেমন জরুরী তেমনই জরুরী উরুসন্ধির রোমশ কাঠবিড়ালির প্রত্যয়ী অস্তিত্ব।

—জানি না। আপনার হেঁয়ালি হেঁয়ালি কথা বুঝি না আমি। সব পুরুষই যা চায় আপনিও আসলে তাইই চান আমার কাছে। তবে শুধু শুধু ভোরের সমুদ্রের উপরের কুয়াশার চাদরের মতো কথার চাদর বিছনো কেন?

—আমি অন্যর মতো নই কুমু। আমি অনন্য। তুমি বলেছিলে নিজে তোমার নাম রাখলে রাখতে কুমুদিনী, অমিও যদি নিজে নিজের নাম রাখলাম তাহলে ডাহুক না রেখে রাখতাম অনন্য।

তারপরই ডাহুক বলল এসব জটিল বিষয় ছেড়ে সহজ বিষয়ে যাওয়া যাক। তুমি কি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ সমুদ্র পারে পুঁচকিকে নিয়ে?

—একা ঘুরে বেড়াবার উপায় কি আছে। ভিড়, দমবন্ধ ভিড় আর কথার কলকলানি। মুখের কথা তো আছেই, তার উপরে এই মোবাইল? যদিও আমরাও মোবাইলেই কথা বলছি মোবাইল ফোন কিন্তু সব জায়গারই শান্তি নষ্ট করেছে। পৃথিবীর কোনো জায়গাই বোধহয় আর নিস্তব্ধ বা নির্জন নেই। আমার এক বন্ধু বলছিল যে, গরুমারা ওয়াচ টাওয়ারে গন্ডার দেখতে গিয়ে মোবাইলওয়ালাদের জন্যে বিরক্তির একশেষ। ডাক্তার মোবাইলে রোগীকে ওষুধ বাতলাছে, ব্যবসায়ী ক' ট্রাক লোহার রড কোথায় যাবে তা বলে দিচ্ছে কর্মচারীকে, স্ত্রী কোন ড্রয়ারে তার আন্ডারওয়ার আছে তাও বলে দিচ্ছে স্বামীকে। ও বলছিল, বনবিভাগের বড়কর্তাকে চিঠি লিখবে সব বনে মোবাইল-এর ব্যবহার বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে।

—সত্যিই তো। এ বড় অন্যায়। অথচ মোবাইল না থাকলে ঝিকারপানি থেকে তোমার সঙ্গে কথাই বা বলতাম কী করে।

—দেখে শুনে মনে হয় মানবজাতির প্রত্যেক নারী-পুরুষেরই বুকের মধ্যে কোটি কোটি না-বলা বাক্য জমে ছিল। মোবাইল ফোন আসার পর সবাই আগল-খেলা কথা শুরু করেছে। ভাবখানা এমন যে আগে বুঝি রোগীর চিকিৎসা হতো না, ব্যবসা হতো না, প্রেমও করত না কেউই।

—ডাহুক হেসে ফেলে বলল, মন্দ বলোনি কথাটা। ভাববার মতো কথা বটে!

—তা এত ভিড়ের মধ্যে হাঁটছই বা কেন? ভিড় ভাল লাগে তোমার?

—আমার ইচ্ছাতে থোড়িই হাঁটছি। পুঁচকির জন্যে। যে আমার শাড়ি খামচে ধরেছে বিকেলে চা খেয়ে ওঠার পরই। বায়না ধরেছে, সমুদ্র

দেখবে। তবে কখনও কখনও আমার কিন্তু ভিড় খারাপ লাগে না। ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। মানে, আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র হারিয়ে যায়। ভিড়ের একজন হয়ে গিয়ে ভিড় থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে একটি টার্ন বা স্যান্ডপাইপার বা সী-গাল হয়ে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে খুব মজা পাই—যে-নিজেকে আমি চিনি না।

—তোমার শরীরকে? শরীর তো রোজই চানঘরে দেখো।

—আহা! শরীর নয়, মনকে। মানুষ তো মন আছে বলেই মানুষ। নইলে তো সে গোদা কচ্ছপ বা রোগা সিঙ্গি মাছ হতো।

—বাঃ। সুন্দর বললে তো কথাটা। তুমি কিন্তু সুন্দর কথা বলো। লিখলেই তো পারো তুমি। লেখো না কেন?

—দুটি কারণে লিখি না।

—কী কী কারণে?

—প্রথমত, সকলেই যদি লেখে তাহলে পড়বে কে?

—আর দ্বিতীয়ত?

আনন্দবাজার যদি সাহিত্য-পুরস্কার দিয়ে দেয়।

ডাহুক জোরে হেসে উঠল। বলল, সেন্স অফ হিউমার আছে তোমার। তবে তুমি পাবে না। পেতে পারো যদি 'ব্রা' নামের একটি উপন্যাস লেখো। বাজারে জোর গুজব যে একটি পুজো সংখ্যায় 'কনডোম' শীর্ষক উপন্যাস লেখা লেখিকা এবারে আনন্দ পুরস্কার পাচ্ছেনই।

কুমুদিনী বলল, গুজব সত্যি নাও হতে পারে। শুনছি, তিলোত্তমা মজুমদারও কম শক্তিশালী লেখিকা নন। পর্নোগ্রাফির দুর্দান্ত প্রতিযোগিতাতে নেমেছেন অনেক লেখক-লেখিকাই। প্রায় জুডোর পর্যায়ে চলে গেছেন সবাই।

—আপনি আমার ছুটির বিকেলের মুডটাই নষ্ট করে দিলেন আজে বাজে বিতিকিচ্ছিরি কিছু প্রসঙ্গ তুলে। এই সব বিষয় কি আলোচনার যোগ্য?

—স্যরি। আমার অন্যায় হয়েছে। ঠিকই বলেছ।

একটু চুপ করে থেকে ডাহুক বলল, ফিরছ কবে? কলকাতা?

—দাঁড়ান সকালে চান করে, ব্রেকফাস্ট করেই বেরোব। বাড়ি পৌঁছে আবার চান করে লাঞ্চ খাব।

—জানি না, এখনও ঠিক জানি না। এবারে আসাটার তো নিশ্চয়তা ছিল কিন্তু ফেরাটা অনিশ্চয়ের হাতে। যখন মনে করবে তখনই ফিরবে। সময়ের বড়ই বাড় বেড়েছে। এবারে সময়কে ইচ্ছেমতো চাবকাব। তার দাস যে আমি আদৌ নই সে কথা প্রমাণ করব।

ডাহুক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, স্বামী কবে ফিরবে?

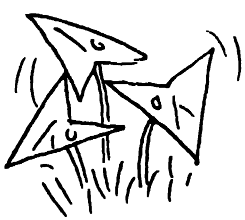
—ও তো পরশু দুপুরেই ফিরবে বলেছে, কালো জিরে কাঁচালঙ্কা দিয়ে তেল-কই খাবে। পদিকে তাইই বলেছি রেঁধে রাখতে।

—একেই তো প্রেম বলে। গার্হস্থ্য বা দাম্পত্য সবই এই....

—কি? তেল-কই? তেল-কইয়ের সঙ্গে প্রেমের কী সম্পর্ক?

—ইয়েস ম্যাম। কীসের মধ্যে যে কী থাকে তা কি সহজে বোঝা যায়? উইশ উ্য অল দ্যা বেস্ট। কব্জি ডুবিয়ে তেল কই দিয়ে ভাত খেয়ে স্বামী তোমাকে শেষ দুপুরে কেমন জম্পেশ করে আদরটা করল সেই খবরটা পরশুই রাতে নেব। এখন ছাড়ছি।

—বা-ই-ই-ই।





৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু ডাহুকদা,

আপনাকে মোবাইলে পেলাম না কিছুতেই। হয় আপনার মোবাইল-এ কিছু গোলমাল হয়েছে নয়তো টাওয়ারের গোলমাল।

আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতাতে ফিরে আসতে হবে। আমার খুব দরকার। আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেই আছেন কিন্তু কেন জানি না, গত ক'মাসে আমার অনবধানে আপনি আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন।

সকাল থেকে আমার মোবাইলটা খারাপ হয়ে গেছে। কাল আমি এসটিডি বুথ থেকে আপনাকে ফোন করব, আজ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তাই করলাম না। তবু আপনাকে এই চিঠি লিখছি কালই স্পিড-পোস্টে পাঠাব বলে।

সংক্ষেপে আপনাকে কী হয়েছে জানাই।

আমি আর পুঁচকি যখন আজ সমুদ্রতীরে বেড়াচ্ছি, সন্ধের পর, হঠাৎ পুঁচকি 'বাবা! বাবা!' বলে উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। আমি বিশ্বাস করিনি। চমকে তাকিয়ে দেখি ও, মানে আমার "স্বামী", স্বামী মোহানার দিক থেকে ফিরছে ঝাউজঙ্গলের পাশ দিয়ে। পাশে, ডায়ানা। ওরই এক বন্ধুর দেহসর্বস্বী স্ত্রী, যাকে, আমি ওর রুচি, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা, মানসিকতা এবং অপার অশিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করি।

আমার মেয়ে পুঁচকিকে বললাম, ও মানুষটি তোর বাবা নারে বোকা মেয়ে। তোর বাবার মতো জামা কি আর কারও থাকতে পারে না? তাছাড়া, বাবা তোর এখন কলকাতাতে। বাবা দীঘাতে আসবে কী করে!

সে তখনকার মতো বুঝল। আমি তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে আমাদের হোটেলের দিকে এগোতে এগোতে ওকে নানা গল্প বলে ওর মন সরাবার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু ওর মনের সন্দেহ গেল না।

ও বলল, কাল সকালে উঠেই আমি বাবাকে খুঁজতে বেরবো।

—কী করে খুঁজবে তুমি?

—কেন? সব হোটেলে গিয়ে বাবার নাম বলব।

তারপরই বলল, বাবার সঙ্গে কে ছিল মা? বেঁটে অরিত্রকাকুর বউ ডায়ানা কাকিমা?

আমি হেসে বললাম, তোর মাথাটা গেছে। তোদের ডায়ানা কাকিমা আর অরিত্র কাকু তো এখন সিঙ্গাপুরে বেড়াতে গেছেন। শুধুই বেড়াতে নয়, একটা কাজ নিয়েও গেছেন।

—অরিত্রকাকু কী করেন মা?

—কে?

—কে আবার? অরিত্রকাকু।

আমি বললাম, উনি বৈয়াকরণ।

—বৈয়াকরণ মানে কি মা?

—যাঁরা ব্যাকরণে পণ্ডিতে।

বাবাঃ! ব্যাকরণ। কাঁধ শ্রাগ করল ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়া

মেয়ে আমার।

তারপর বলল, সামনের বছর থেকে আমাদের নেসফিল্ডের গ্রামার পড়তে হবে। আন্টি বলে দিয়েছেন।

আমি চুপ করে রইলাম। ওর মাথা থেকে ডায়ানা পেত্নীকে যে আপাতত তাড়াতে পারা গেছে তা জেনেই তখনকার মতো আশ্বস্ত হলাম।

ডাহুকদাদা, চিঠি আর বড় করব না। আমি কাল ভোরেই কলকাতায় ফিরছি। গাড়ি নিয়েই এসেছি। ফেরার অসুবিধা নেই। পুঁচকিকে বলব, ও শুয়ে পড়ার পর কলকাতার অফিস থেকে জরুরি তলব এসেছে কলকাতাতে ফিরে যাবার। তবে তারাও যদি কাল সকালেই ফেরে, (তারাও নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে এসেছে) তাহলে পথে দেখা হয়ে যেতে পারে। তবে আজ শুক্রবার। মনে হয় না তারা উইক-এন্ড না কাটিয়ে ফিরেবে। যদিও কবে এসেছে তা জানি না। আপনি কলকাতা ফিরেই একটি ফোন করবেন। আশা করি, আমার জীবনের এই সঙ্কটে এটুকু আপনি করবেন আমার জন্যে।

আমি জানিয়ে দেব কোথায় দেখা করব। বুঝতেই পারেন যে, বাড়িতে দেখা করার অসুবিধা আছে। ইতি আপনার —নিজের আসল নামটা লিখে, কেটে লিখেছে 'কুমুদিনী'।

ডাহুক দত্ত। ঝিকারপানি বনবাংলো পুরুলিয়া।

বলাই বাহুল্য যে, চিঠিটা যখন ঝিকরপানিতে পৌঁছল তার তিনদিন আগেই কুমুদিনী কলকাতা পৌঁছে গেছে। পরে জেনেছিলাম যে তার স্বামীও পৌঁছেছে দু'দিন পরে, রাতে, প্রচণ্ড মত্ত অবস্থাতে।

পাঠক। আপনাদের পটভূমি সম্বন্ধে একটু অবহিত করে নেওয়া দরকার। কুমুদিনীর আসল নাম অন্য। অনেক কারণে সেটি উল্লেখ করা যাচ্ছে না। ডাহুক দত্ত, বর্ষীয়ান লেখক একদিন তাকে বলেছিল যে তাকে নিয়ে একটি লেখা লিখবে।

তাতে সে বলেছিল, নায়িকার নাম কী রাখবেন?

কেন? তোমার নাম। নয়তো কল্পিত কোনও নাম, রেশমি বা ঈশানী

বা সুপর্ণা বা অর্পিতা বা নন্দিনী বা অন্য কিছু।

তারপর বলেছিলেম, তুমি যদি তোমার নিজের নাম রাখতে তবে কী নাম রাখতে?

ও বলেছিল, সত্যি! প্রত্যেকের জীবনেই এটা একটা ট্রাজেডি। নিজের নামের উপরে নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অথচ থাকলে কী ভালই না হত। তবে আমি যদি আমার নিজের নাম রাখতাম তাহলে রবিঠাকুরের কোনও নায়িকার নাম রাখতাম। চার অক্ষরের নাম। খুব সম্ভ্রান্ত নাম। আমার খুবই ভাল লাগে। এক বিশেষ যুগের গন্ধ মাখা থাকে সেইসব নামে। তাই না?

কীরকম?

যেমন কুমুদিনী। আমি শান্তিনিকেতনেই বড়ো হয়েছি বলেই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ আমাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছেন বলেও। আমার মানসিকতায় এবং রুচিতেও।

ডাহুক বলেছিল, ব্যাপারটা খুব স্বাস্থ্যকর নয়। একজন মানুষ, তিনি যত বড়ই হন না কেন, তিনি পুরোপুরিই অন্য কারোকে গ্রাস করে রইবেন এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

বাঞ্ছনীয় কি না জানি না, তবে এটাই ঘটনা।

তোমার স্বামী কিন্তু একেবারেই অরাবীন্দ্রিক। আমার কথাতে কিছু মনে কোরো না।

সত্যিটা তো সত্যিই। তাতে মনে করার কী আছে। তা ছাড়া, ডাক্তারের সঙ্গে যেমন ডাক্তারের বিয়ে না হওয়াই ভাল, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারের, অধ্যাপকের সঙ্গে অধ্যাপিকার, তেমনই আবার প্রচণ্ড রবীন্দ্রভক্তর সঙ্গে অরাবীন্দ্রিকের বিয়ে হওয়াটা কিন্তু ভাল। অন্যের প্রফেশান বা পেশা সম্বন্ধে একটু রহস্য থাকা যেমন ভাল, স্বামী ও স্ত্রীর জগত পুরোপুরি বিপরীতমুখী হওয়াটাই ভাল। তাতে একঘেয়েমির আগমন ত্বরান্বিত হয় না। আমি অন্তত তাই ভেবেছিলাম। এখন বুঝি, যে ভুল বুঝেছিলাম। যে মানুষের রবীন্দ্রনাথে ভক্তি নেই সে অমানুষ বা অবশ্যই কম মানুষ।

কুমুদিনীর স্বামীব প্রতি অশ্রদ্ধাজনক অনেক কথা ডাহুক বে-এক্তিয়ারে বলা সত্ত্বেও অপরাধ বোধ করেনি। সত্যি কথা বলতে কি কুমুদিনীর আট-ন'বছর হল বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও এবং স্বামীর শিকড়ও শান্তিনিকেতনেই প্রোথিত থাকা সত্ত্বেও সে যে একেবারেই অন্যরকম এবং কুমুদিনীর সঙ্গে যে তার কোনও দিক দিয়েই কোন মিল ছিল না এ-কথা ডাহুক কুমুদিনীর নানা কথাতে বুঝেছিল। শান্তিনিকেতনও যে আগের শান্তিনিকেতন নেই, তার আবহ, তার নবাগন্তুক সব কলকাতাবাসী বিত্তবান, অ-রাবীন্দ্রিক গাড়ির ধুলো-ওড়ানো মানুষদের প্রভাবে পুরনো শান্তিনিকেতন দিনে দিনে যে এক রৌরবে পরিণত হয়েছে এ কথা ডাহুক ভাল করেই বোঝে।

তবে কুমুদিনীর স্বামীদেরও কিছু বক্তব্য অবশ্যই আছে। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে আর বিনয়ভবনে পড়েছে বলেই কি আমাদের সেই দাড়িওয়ালা বুড়োর অন্ধ তাঁবেদারি করে যেতেই হবে? তাঁর গানের আর সাহিত্যের কপিরাইট উঠে গেল আর অন্য সব ব্যাপারেও অটোক্র্যাটিক সর্দারির করিপাইট কি উঠবে না? আগেকার দিনে শান্তিনিকেতনী মানুযেরা, তাবড়, তাবড় মানুযেরা অনেকই লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকু-ঢুকু করতেন, আর আমরা প্রকাশ্যে মদ খাই। তাতে দোষের কী? শান্তিনিকেতনীদের মধ্যে চিরদিনই এক ধরনের ভণ্ডামি পারফ্যুমের গন্ধর মতো লেগে থাকত। ঘোমটার তলায় খেমটা নাচ। আমরা প্রকাশ্যেই করি যা করার। আমরা রবীন্দ্রনাথের গান না গেয়ে ব্যান্ডের গান গাই। আমরা একটা নতুন ব্যান্ড করে তার নাম দিয়েছি 'কেঁচে গণ্ডুষ'। পুরনো যা কিছু তা উড়িয়ে দেওয়াই আমাদের ধর্ম। আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আমি আমার স্ত্রীর মতো দীর্ঘ নেকু নেকু প্রেমপত্রে বিশ্বাস করি না। এমন নষ্ট করার মতো অত সময় কার আছে। যব মিঞা বিবি রাজি, কেয়া করে কাজি। হাম তুম কামরামে বন্ধ। প্রেমের আলটিমেট সিনথেসিসটা কী? ফিজিক্যাল লাভ। না, কি? আমাদের ইনিয়ে-বিনিয়ে, এ গলি সে গলি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছনোর সময় নেই। উই টেক আ রান সেট্রইট টু দ্য গোল। ইজ দয়ার এনিথিং রং ইন ইট?

এ সব কথা কুমুদিনীর মুখেই শুনেছিল ডাহুক। জবাবে কিছুই বলেনি। কুমুদিনীর স্বামীর, যার নামই 'স্বামী', বক্তব্যে ভার যে ছিলো না তা নয়, তবে ডাহুকের মতো রবীন্দ্রভক্তর মনে হয়েছিল যে সার কম ছিল। ওর মনে হয়, রবীন্দ্রভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরভক্তির মিল আছে। যে মানুষ অনেক মনুষ্যজন্ম পেরিয়ে না এসেছে তার পক্ষে ঈশ্বর-বিশ্বাস যেমন নয়, তেমনই শিক্ষা ও রুচির বেশ কয়েকটি সোপান না উঠে এলে মানুষের পক্ষে রবীন্দ্রভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। যদি কেউ শান্তিনিকেতনে বড় হয়ে উঠে, পড়াশোনা করেও রবীন্দ্রভক্ত না হয়, তবে তাকে কিছু বলার নেই। তাকে অনুকম্পা বা ক্ষমা করাই উচিত। রবীন্দ্র-সাহিত্য, রবীন্দ্রগানকে যে হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারল না তাকে অনুকম্পা ছাড়া আর কীইবা করা যেতে পারে।

ওদের দুজনের মধ্যে এত রকমের অমিল যে ওদের দাম্পত্য যে মধুময় হবে না এতো জানা কথাই। কুমুদিনীর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে কী করে স্বামীকে স্বামী হিসেবে নির্বাচন করল স্বেচ্ছায়, এটা ভাবলেও অবাক হয় ডাহুক। কোনওদিন সুযোগ হলে একথা জিজ্ঞেস করবে ও কুমুদিনীকে।

জগদীশকে কলকাতায় বাড়িতে ফোন করে দিয়েছিল। সে ড্রাইভার পুলিনকে হাওড়া স্টেশনে পাঠিয়েছিল। তাই বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হয়নি।

বাড়ি ফিরে চান করে ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে একটু গড়িয়ে নিল। বয়স যে হচ্ছে তা এখন বুঝতে পারে। শরীর বিশ্রাম চায়। বছরের প্রথম ইলিশ খেয়ে শরীরটা একটু আয়েসও চাইছিল। মাছ ভাজা, মাছের গরম তেল, সর্ষে ইলিশ, ইলিশের মাথা দিয়ে কচুর শাক, তারপর ইলিশের মাথায় তেঁতুল দেওয়া টক। জগার রান্নার হাতটা বড়ো ভাল। আজ কুড়ি বছর হল রয়েছে সে ডাহুকের কাছে। ও-ই কেয়ারটেকার-কাম-গার্জেন ডাহুকের। আলমারির চাবিটাবিও সব ওর কাছেই থাকে। জগাও ডাহুককে দেখে, ডাহুকও জগাকে। জগার মেয়ের বিয়েও দিয়েছে জগা সৎ পাত্রে। ছেলেকে এঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা

কোর্সে ভর্তি করে দিয়েছে। তবে ছেলেটা মেধাবী। মেয়েটাও গ্র্যাজুয়েশন করেছে বাংলাতে। ডাহুকের লেখার একজন ভক্ত পাঠিকা সে।

ঠিক করল এক ঘুম দিয়ে উঠে ফোন করবে কুমুদিনীকে—তখন সময়টাও ভদ্রগোছের হবে—কুমুদিনীও নিশ্চয়ই বিশ্রাম করছে এখন যদি অফিসে না গিয়ে থাকে। ও আর্কিটেক্ট। নামী একটি আর্কিটেক্ট ফার্মে কাজ করে ও। আর দু'এক বছর পরে পার্টনারও হয়ে যাবে।

ঘুম ভেঙে উঠে মোবাইলে ফোন করল কুমুদিনীকে। কোথায় আছে তা না জেনে আন্দাজে ল্যান্ডলাইনে ফোন করে লাভ নাই। ফোন ধরলও কুমুদিনী।

ডাহুক বলল, তুমি কোথায়? অফিসে? তাহলে পরে করব।

—না ডাহুকদা, আমি শান্তিনিকেতনে।

—শান্তিনিকেতনে? কবে গেলে?

—দীঘা থেকে ফিরেই।

—তোমার মতলবটা কী? চাকরি কি ছেড়ে দেবে?

—না ছাড়ব না। তাছাড়া, আমার এম্পলয়ার ছাড়ালেও আমার হাতে তিন-তিনটি লুক্রেটিভ অফার আছে। বেকার হবার আশঙ্কা নেই। আসলে অনেক ছুটি জমে গেছে আমার। দু-তিনদিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে আসা ছাড়া সচরাচর আর কোথাও তো যাই না। তাও প্রধানত পৌষোৎসবে আর বসন্তোৎসবে। পৌষোৎসবে অবশ্য বাড়িতে বা বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেই যাই। এখনকার মেলাতে বা গৌড়প্রাঙ্গণে যাওয়া যায় না। যাচ্ছেতাই ভিড়।

—তুমি আজকাল ব্যক্তি হিসেবে বড়ো ডিফিউজড হয়ে যাচ্ছ।

—কেন?

—যে প্রশ্নর উত্তর এক কথায় দেওয়া যায়। তার উত্তর দিতে তুমি পঞ্চাশটি শব্দ ব্যবহার কর। এমন তো ছিলে না আগে।

—কথোপকথনে বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আমি কি শুধু কথোপকথনেই বদলেছি? অন্য পিছুতে নয়? আমি তো সব দিক দিয়েই বদলে গেছি। হয়তো আরও বদলাব।

—পুঁচকি কী করছে?

—পুঁচকি এখানে নেই।

—মানে?

—মানে, পুঁচকিকে স্বামী গায়ের জোরে ওর কাছে রেখে দিয়েছে, আসতে দেয়নি আমার সঙ্গে।

—কাঁদল না মেয়ে তোমাকে ছেড়ে দিতে?

—না। জানেন, আশ্চর্য। ও খুব বাপ-সোহাগি। অথচ ওর বাবা ওর জন্যে প্রায় কিছুই করে না। কিছু মেয়ের মধ্যে সম্ভবত খুব কম বয়সেই ইডিপাস কমপ্লেক্স ডেভলাপ করে।

—তুমি কী করবে এখন?

—কী করবে? গলা ছেড়ে কাঁদব?

ডাহুক একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, না, তা বলিনি।

তারপরে কুমুদিনী বলল, ছবি আঁকছি আর গান শুনছি। মোহরদি, বাচ্চুদি আর ঋতুদির গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলো বারবার করে শুনছি। আর একজন ডিভোর্স-লয়ারের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি, অ্যাপয়েন্টমেন্টও করেছি। কলকাতাতে গিয়েই দেখা করব।

—এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে?

—কী করব? আমার পুঁচকিকে তো আমি চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারি না। আপনার মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি। আসলে তাড়াতাড়ি নয়। অনেকদিন ধরেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম।

—পুঁচকি তো তোমার একার নয়।

—একারই তো! স্বামী গর্ভাধান করা ছাড়া আর কী করেছে? দশমাস দশদিন আমিই তাকে গর্ভে ধরেছি, থুড়ি, ন'মাস পঁয়তাল্লিশ দিন, সিজারিয়ান সেকশন হয়েছিল তো।

ডাহুক চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। আজকালকার ছেলেমেয়েদের ঠিক বুঝতে পারে না ও।

—কী হল? কিছু বলুন।

তারপরেই বলল, আকাশে খুব মেঘ করেছে, মনে হয় বিকেলের দিকে খুব জোর বৃষ্টি নামবে। যদি নামে, তা হলে কোপাই-এর দিকে চলে যাব। এমনই এক বর্ষার দিনে কোপাই-এর ধারে স্বামী আমাকে প্রেপোজ করেছিল।

—তাহলে? ভাল তো সে তোমাকে বেসেছিল একদিন।

—একদিন! অবশ্যই। তবে তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি যে ভালবাসার অনেক রকম হয়।

—তবে?

—পুরুষের ভালবাসা মরসুমি ফুলের মতো বা মহুল ফুলের মতো। শীত আর বসন্ত অপগত হলেই তাদের গন্ধ উবে যায়।

—তুমি তো ভুলও বুঝতে পারো ওকে।

—না। বুঝিনি।

তারপরই অসহিষ্ণু গলাতে বলল, এত কথা ফোনে হবে না ডাহুকদা। আপনি শান্তিনিকেতনে চলে আসুন। আপনি তো একজন লেখক। নিজের মালিক নিজেই—আপনার তো কোনও মনিব নেই, চাকরি করতে হয় না কারোরই। আনন্দবাজার বা অন্য কোনও কাগজের মাইনে করা কর্মচারীও নন আপনি। আপনি তো যখন-তখন যেখানে সেখানে চলে যেতে পারেন। আর যানও তো।

—তোমার কথা অংশত ঠিক। তবে লেখকমাত্রই চাকরি আছে, মালিকও আছে। আর লেখাই তার মনিব। এই মনিব-কর্মচারী সম্পর্কটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তা ছাড়া, তোমার এই বিপদে আমি গিয়ে কী করব? আমি তোমার কে?

—বাঃ বিপদে পাশে থাকবেন না, শুধু কি সম্পদেই থাকবেন?

—আমি তোমাকে উপদেশ দিতে পারি, সৎ পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু তোমার বাবা বা মা অন্য পরিজনেরা যে উপদেশ দিতে পারেন তা তো আমি দিতে পারি না। আমার সে অধিকারও নেই।

—পারেন। আপনি তো জানেন যে আমার বাবা বহুদিনই নেই। মা

আছেন, তিনি খুবই অসুস্থ। তাঁকে আমি বিব্রত করতে চাই না। তা ছাড়া, যে কথা আমি আর কারোকেই বলিনি, সে কথা আপনাকে বলব।

—কী সে কথা।

—স্বামীর প্রতি আমার মায়ের এক অন্ধ স্নেহ আছে। তার কারণ...

—কী কারণ?

—কারণটা লজ্জার। আমার মায়ের সঙ্গে স্বামীর বাবার একটি সম্পর্ক ছিল। শারীরিক সম্পর্কও। আমার দৃঢ় ধারণা, যে ধারণার পেছনে যথেষ্ট প্রমাণ-সাবুদও আছে, স্বামী, আমার মায়েরই সন্তান।

ডাহুক ভাবছিল, কোনও পুরুষের এমন নাম হয় শোনেনি—স্বামী। কোনও মেয়ের স্বামীর নাম স্বামী।

—সে কী! তাহলে তোমার হাফ-ব্রাদার, সৎ ভাই?

—হ্যাঁ ডাহুকদা। স্বামীর বাবা অশেষ গুণী ছিলেন। অত্যন্ত সুপুরুষও। ভাল বাঁশি বাজাতেন, মূর্তি গড়তেন, নামী ভাস্কর ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল, মাতাল, অনিয়মানুবর্তী এবং নিষ্ঠুরও ছিলেন। পুরোপুরি দায়িত্বজ্ঞানহীন, ন্যায়-অন্যায় বোধহীন। উনি যেভাবে আমার বাবার বন্ধুত্বের অবমাননা করে মুহূর্তের লীলাখেলাতে মায়ের গর্ভাধান করেছিলেন, স্বামীও তেমনই করেছিল আমায়। গর্ভবতী হওয়ার পরেই অমি বিয়ে করি খুব তাড়াতাড়ি। সিজারিয়ানটা আগে করাতে কেউ জানতে পারেনি।

—প্রেমে তো ন্যায়-অন্যায়বোধ থাকে না কুমুদিনী। "ন্যায়-অন্যায় জানি না, জানি না, শুধু তোমারে জানি, ওহে, সুন্দরী।" আমি যে তোমাকে ভালবেসেছি সেটাও কি ন্যায়সঙ্গত?

কুমুদিনী হেসে বলল, ভাল কি সত্যিই বেসেছেন? জানি না।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, বলুন কবে আসছেন? আপনার তো ওঠার জায়গার অসুবিধা নেই—আপনার ভাষাতে একটি 'পর্ণকুটির' তো আছেই।

—তা আছে। তবে সত্যিই পর্ণকুটির। মেরামতির অভাবে এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। অনেক টাকার দরকার ঠিকমতো মেরামতি করতে।

—জরাজীর্ণ বাড়ির এক অন্য রোম্যান্টিকতা আছে। বলেই বলল, সাপ আছে আপনার বাড়িতে?

—থাকা তো উচিত। যা জঙ্গল হয়েছে। তবে বাড়ি আমার তেমন জরাজীর্ণ নয়, বাড়ির মালিক জরাজীর্ণ হতে পারে।

—ব্যাঙ আছে?

—ব্যাঙ? না নেই। থাকলে ভাল হত। বর্ষার রাতে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাক শোনা যেত।

—আমাদের বাড়িতে অনেক ব্যাঙ। আগে যে কাজের ছেলেটি ছিল ও ব্যাঙের তরকারি বানিয়ে খেত বলে মা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ও যাওয়ার পরে এখন ব্যাঙ বেড়ে গেছে। আপনি আসুন, নয়তো আপনার বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব তখন থলেতে করে ক'টা ব্যাঙ নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব।

ডাহুক হাসল। বলল, পাগলি।

কুমুদিনী বলল, তার বদলে, মানে, ব্যাঙের বদলে, আপনার বাড়ির নাগচম্পা গাছের পাখির বাসা থেকে একজোড়া ডাহুক পাখি ধরে এনে আমাদের কনকচাঁপা গাছে রেখে দেব। ডাহুক কি শুধু ডাহুক দত্তর বাড়িতেই থাকবে?

ডাহুক বলল, সামনের সপ্তাহে আমার একটি জরুরি কাজ আছে বাইরে। শান্তিনিকেতনে তোমার শমন পেয়ে গেলে এখনই যেতে হয়। কালই যাব আমি। তুমি বিকেলের দিকে ফোন করে বংশীর কাছ থেকে জেনে নিও আমি পৌঁছেছি কি না। অথবা, কখন পৌঁছব। ফোন নম্বরটা লিখে নাও। অবশ্য মোবাইল নাম্বার তো জানোই।

—কোন ট্রেনে আসবেন? আমি কি স্টেশনে গাড়ি পাঠাব? এবারে গাড়ি নিয়ে এসেছি। সব বার আসি না।

—একেবারেই নয়। শান্তিনিকেতনে আমি গাড়ি চড়া একদম পছন্দ করি না, কেউ চড়লেও বিরক্ত হই। পুরো পরিবেশটা গাড়ি আর ট্রাক আর বাসে নষ্ট করে দিল।

—সেটা ঠিক। তবে হঠাৎ আসব ঠিক করলে ট্রেনের টিকিট না

পেলে অনেক সময়ে গাড়িতে আসতে হয়ই।

—এখন তো অনেকগুলো ট্রেন। উৎসবের সময়ে ছাড়া টিকিট পাওয়ার অসুবিধা তো হওয়ার কথা নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা, গণদেবতা, ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস এবং আরও একটা নতুন ট্রেন চালু করলেন সেদিন লালুপ্রসাদ—কী একটা অদ্ভুত নাম—মনে পড়ছে না। তাছাড়া টিকিট যদি না পাও আমাকে বোলো। আমার এক চেলা আছে, তপন দাস, রেলের খুব বড়ো অফিসার। সে টিকিটের বন্দোবস্ত করে দেবে।

—বাবাঃ। আপনি দেখছি ইস্টার্ন রেলের টাইম টেবল মুখস্থ করে রেখেছেন।

—কী করব। গরজ বড়ো বালাই।

তারপর বলল, কাল যখন দেখা হচ্ছেই এখন তাহলে ছাড়ি। আজকেই একটি গল্প শেষ করতেই হবে। প্রসাদ পত্রিকার তপন রাত দশটাতে বাড়িতে এসে নিয়ে যাবে। আমি কথা দিলে, আমার ডেডবডিও কথা রাখে।

—তাই? আমার বেলাতে আপনার ডেডবডিকে রাখতে হবে না। যত্ত আজে-বাজে কথা। প্রসাদ কি একটা কাগজ হল?

—নয় কেন? প্রসাদ অনেক নামী ও বিজ্ঞাপিত সিনেমা পত্রিকার থেকে ভাল।





১০

এটা কোনও স্টেশন নয়। খুব কম মানুষই এই স্টেশনে ওঠানামা করেন। এর চেয়ে বরং এক মিনিট স্টপেজ-এর 'গুসকরা' স্টেশনেও বেশি মানুষ ওঠেন নামেন। গুসকরাতে সোমনাথ চ্যাটার্জিকেও নামতে দেখেছে ডাহুক একাধিকবার। এটা হয়তো স্টেশনও নয়। রেলের পরিভাষাতে 'হল্ট'। নাম 'পিচকুড়ির ঢাল।' শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস বটেই, হয়তো অন্য ট্রেনও দাঁড়ায় এখানে। যাওয়ার সময়ে দাঁড়াবেই। এই ঢালে কী পরিমাণ জল দাঁড়িয়েছে তা দেখে এ অঞ্চলে প্রতি বছরের বৃষ্টিপাতের একটা অন্দাজ করেন অভিজ্ঞজনে। এখন পিচকুড়ির ঢাল-এ দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। সম্ভবত সিগন্যাল পায়নি বলে। সামান্য দাঁড়াল। তারপরই ছেড়ে দিল।

ট্রেন যখন ঢুকল শান্তিনিকেতন স্টেশনে তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অন্ধকার করে এসেছে। এমন অবস্থাতে স্টেশনে নেমে প্রতিবারই ভয় হয় বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বৃষ্টি যদি নামে তো ভিজে একসা হয়ে যাবে ডাহুক। কিন্তু আজ অবধি এত বছরে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি।

মেঘ-মেয়েরা বড়ই সদয়।

কাঁধে ঝোলানো ছোট ব্যাগটি নিয়ে ডাহুকের গাছ-পালাতে সমাকীর্ণ ছায়াচ্ছন্ন পর্ণকুটিরের সামনে রিকশা থেকে নামতেই বংশীবদন এবং তার ভাগ্নে মদন দৌড়ে এসে ব্যাগটি নিল। পায়জামা পাঞ্জবি, তোয়ালে, দাড়ি কামানোর জিনিস সব এখানেই থাকে। নিজের বাড়ি থাকার এই সুবিধা—লটবহর নিয়ে যাতায়াত করতে হয় না। বংশীবদন তার ভাগ্নে মদন এবং তার কুকুর ন্যাওটা প্রকৃতই খুশি হয় ডাহুক এলে।

—কী রেঁধেছিস?

—যা প্রতিবার রাঁধি।

শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস একেবারে লাঞ্চ টাইম-এ এসে পৌঁছয়। প্রতিবারই বংশীবদন সুগন্ধি আতপ চালের ফেনা ভাত, তাতে দুটি আলু, দুটি হাঁসের ডিম, দুটি পটল, একটু পেঁপে, একফালি কুমড়ো, একটি দুটি উচ্ছে এইসব সিদ্ধ দিয়ে রাখে। টেবলের উপরে প্লেটে আমুল মাখনের একটি স্ল্যাব, ডিপে কাঁচা লঙ্কা এবং কাঁচা পেঁয়াজ, সদ্য ছাড়ানো, সাজিয়ে রাখে। পিপাসার্ত থাকলে টকটক করে অ্যাঙ্গুস্টুরা বিটার্স দিয়ে দুটি ভদকা মেরে দিয়ে খেতে বসে ডাহুক। আজ মেঘ-ভারাক্রান্ত শ্রাবণ আকাশ আর ঝুরু হাওয়াতে ইচ্ছে করল খেতে। হাওয়াটা উথাল-পাথাল করছে প্রকৃতিকে। তার বুক যেমন করে মাঝেমধ্যে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে পাখির ডাকের বাতাবরণে মেঘের গুরু গুরু আওয়াজের মধ্যে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার এমন সুখ শান্তিনিকেতনের মতো কম জায়গাতেই আছে।

খেতে বসতে না বসতে কুমুদিনী ফোন করল।

—নিশ্চয়ই ঘুমোবেন খেয়ে উঠে?

—যদি বলো তো ঘুমোব না।

—না, না ভাল করে ঘুমোন। মাথা সাফ হবে। আমি কটাতে আসব?

—তুমি বলো।

—যখন গেলে আপনি বিরক্ত হবেন না।

—আঃ! তোমার সঙ্গে দেখা করতেই তো আসা। বলো না কখন

আসবে?

—পাঁচটাতে এলে ঠিক আছে তো? অথবা তার একটু পরে।

—তুমি যখনই আসবে তখনই সুসময়। বলো কী খাবে?

—যা খাওয়াবেন।

রাতে খেয়ে যেও।

—তা তো খাবই। রিকশা করে যাব। গাড়ি না নিয়ে এলে আমার রিকশা চব্বিশ ঘন্টা আমাদের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে। আমার গাড়ির ড্রাইভারের শ্বশুরবাড়ি ইলামবাজারে। সে শালীবাহন হওয়ার জন্যে সেখানে চলে গিয়েছে। পরশু ফিরে আসবে সকালেই। আমিও ফিরতে পারি কলকাতাতে, সেদিনই।

—কোথায় ফিরবে?

—আমার ফ্ল্যাটে।

—সেটা তো তোমার স্বামীরও ফ্ল্যাট।

—ওটা আমার কোম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাট। ওকে থাকতে দিতাম বলে থাকত। স্বামী পুঁচকিকে নিয়ে কোথায় উঠেছে জানি না। ডায়ানার ওখানেও উঠতে পারে। মেয়েটাকে ডাইনিটা গলা টিপে মেরে না রাখে।

গলা ভারী হয়ে এল কুমুদিনীর। তারপর বুজে এল কান্নায়।

তারপরে বলল, ওর হাজব্যান্ড শুনেছি অফিসের কাজে কুয়ালালামপুরে গেছে। ডিভোর্সের উকিলের কথামতো একটি ডায়ারিও করে এসেছি থানাতে। পুঁচকিটার জন্যে মনটা ভারি খারাপ লাগে ডাহুকদা।

ফেনাভাতে ডিম ডলতে ডলতে ডাহুক বলল, স্বাভাবিক।

—ঠিক আছে। রাখছি আমি।

বলেই, যেমন হঠাৎই কোন করেছিল, তেমন হঠাৎই ফোনটা কেটে দিল কুমুদিনী।

ডাহুক বংশীকে বলল, আজ মাংস পাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ বাবু।

—শামবাটীর উৎপলের দোকান থেকে আনবি না। বিরাট বিরাট

খাসি কাটছে শুনছি আজকাল। তুই বোলপুর রোডে সিনেমা হলের পরের পেট্রল পাম্পের উল্টোদিকের দোকানটা, আঃ কী যেন নাম? বংশীবদন বলল, গৌরহরি।

—হ্যাঁ। গৌরহরি। সেই দোকান থেকে কচি পাঁঠার মাংস আনবি। ভাল করে খিচুড়ি করবি, সঙ্গে কষা মাংস আর পেঁয়াজি।

—টোম্যাটোর চাটনি করব না?

—হ্যাঁ করবি বৈকি।

—আর বিকেলে বড়ো রুই পেলে বাজারে, রুইমাছ ভাজা করবি বড়ো বড়ো টুকরো।

—আর শুকনো লঙ্কা ভাজা?

--তাও কি আলাদা করে বলতে হবে? আর শোন, কুমুদিনী সন্ধের সময়ে আসবে। চা খাবে। আরামবাগ থেকে টেংরি কাবাব নিয়ে আসবি একডজন। তুই, তোর ভাগ্নে মদন আর তোদের ন্যাওটাও তো খাবি, না কি?

—চাটনিতে আদা, পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কা পড়বে তো?

—অবশ্যই পড়বে। বড়ই বিরক্ত করিস। জানা কথা নতুন করে শুধোস কেন? আচ্ছা শোন, খিচুড়ি যেন বাসমতী চালের করে বসিস না। খিচুড়ি সেদ্ধ চালেরই ভাল হয়।

—স্বপনবাবু যে রায়গঞ্জ থেকে তুলাইপাঞ্জী চাল পাঠিয়ে দিলেন দশ কেজি তা দিয়ে কী করব?

—মাঝে মাঝে পোলাও করবি। এমনি ভাতও করবি। গাওয়া ঘি দিয়ে খেতে চমৎকার। আমার এ চালের গন্ধটা বাসমতীর চেয়েও ভাল লাগে।

রায়গঞ্জের কথাতে ডাহুকের মনে পড়ে গেল, রায়গঞ্জে যখন বইমেলা উদ্বোধন করতে গেছিল ডাহুক তখনকার কথা। সেই স্কুল-দিদিমণির কথা। ফলসারঙা শাড়ি পরা—বইমেলাতে একদল কচি-কাঁচার শোভাযাত্রা করিয়ে নিয়ে এসেছিল—বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল নাকে। বয়স বাইশ-তেইশ হবে। তুলাইপাঞ্জী চালেরই মতো সুগন্ধ ছিল

নিশ্চয়ই তার গায়ে। অনেক খোঁজ করেও তার হদিশ পায়নি ডাহুক। স্বপনটা একটা ওয়ার্থলেস। খেতে বড়ো ইচ্ছে হয়েছিল সেই নবীন দিদিমণিকে। কত রাতে যে স্বপ্ন দেখেছে।

—আর একটু ভাত দিই? আপনাকে জগাদা বোধহয় ভাল করে দেখে না। আপনি তো বেশ রোগা হয়ে গেছেন বাবু। প্রায় ছ'মাস পরে দেখছি।

রায়গঞ্জের নবীন দিদিমণির ঘোরে ছিল। হঠাৎ চমকে উঠল ডাহুক। তুতলে বলল, না না আর ভাত নয়। তুই দেখছি আমার ঠাকুমা হয়ে গেলি। রোজই বলতেন "আর দুটো ভাত নিস না কেন? তোর হাতদুটো শুকনো শুকনো লাগে।"

বংশীবদন বলল, তাঁদের চোখই ছিল স্নেহের। তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনা।





১১

বিকেল পাঁচটার কিছু পরে রিকশার ঘন্টি শোনা গেল। ডাহুকের বাড়ির গেট-এ। মদন আর ন্যাওটা দৌড়ে গেল তা শুনে। ডাহুক বসবার ঘরের দরজাতে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, এসো, এসো কুমুদিনী। কুমুদিনীর কথা বলার ভঙ্গিটিও ভারি আদুরে আদুরে। ডাহুকের চোখে ও এক মসৃণ বেড়ালনি। দেখা হলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। কুমুদিনী যে কোনো জায়গাতে এলেই সেই জায়গা যেন আলোকিত হয়ে যায়। ওর চেহারায়, চলনে বলনে, ওর সব কিছুতে এমন কিছু আছে যা মুহূর্তের মধ্যে যার কাছে সে আসে, তাকে দীপিত করে।

ভিতরে ঢুকে ডাহুক বলল, বাইরের ঘরে বসবে, না আমার শোবার ঘরে যাবে? তোমার তো অনেকই ব্যক্তিগত কথা বলার আছে।

—তাই ভাল। আপনার শোবার ঘরেই চলুন। তারপরেই বলল, শোবার ঘরে বসাটা কেমন যেন বেমানান না? বসার ঘরেই বসি চলুন।

তারপর ডাহুকের বসার ঘরে যেতে যেতে হেসে বলল, এলেন তা হলে! আপনার আসা তো নয়, আবির্ভাব।

—এ কথা তো তোমার বেলাতেই প্রযোজ্য। তোমাকে দেখলেই

ফিরাখ গোরখপুরীর একটি শের মনে পড়ে যায় আমার।

—কী?

—"তেরী আঁখোকি কুছ কসুর নেহি, মুঝেই খরাব হোনা থা।"

কুমুদিনী বলল, থাক আর প্যায়েরভি করতে হবে না।

ঘরের মধ্যের সবচেয়ে আরামদায়ক এবং বড়ো চামড়ার সোফাটি, যেটিতে বসে ডাহুক বই পড়ে, দেখিয়ে বলল, বোসো।

বাঃ—। বি কমর্ফটেবল।

তোমাকে দেখলেই আমার লেসলি এবারকম্বির একটি কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। জানো?

—কী কবিতা?

'She! She! like a visiting sea
Which no door could ever restrain."

—ওহ, হোয়াট আ কমপ্লিমেন্ট! দো আই ডোন্ট ডিজার্ভ ইট। আই অ্যাম জেনুইনলি ইলেটেড ডাহুকদা। সত্যিই জীবনের দিগন্তবেলায় যে কেন আপনার সঙ্গে দেখা হল।

—দিগন্তবেলা তা আমার। তোমার তো বসন্তের দিন।

—হাঃ। আমার বসন্ত। কখন যে বসন্ত গেল এবার হল না গান। ঋতু গুহর গলাতে অথবা ডিস্কে শুনেছেন এই গানটি।

—অবশ্যই শুনেছি।

—আপনার সঙ্গে আমি একমত। ঐ প্রচারবিমুখ, অন্তর্বাসী অন্তর্মুখি মহিলার তুলনা সত্যিই নেই। অথচ তাঁকে নিয়ে আজ অবধি কিছুমাত্রই হল না।

—কী হল না?

—এই অভিনন্দন, সংবর্ধনা, সম্মাননা ইত্যাদি ইত্যাদি।

—কেউ বন্দোবস্ত করলেও আমার মনে হয় উনি নেবেন না। উনি টিভি স্টুডিওতেই যেতে চান না। এই প্রচার প্রসারের দিনে ওঁর মতো প্রচার বিমুখ মানুষ সত্যিই দেখা যায় না। একটা কথা বলো কুমুদিনী। এই গান-বাজারের মধ্যে ঋতু গুহকে তোমরা টেনে এনো না। অন্যদের সঙ্গে

তুলনা কোরো না। সুচিত্রাদি, মোহরদি, বাচ্চুদি, কমলা বসু এবং তার আগে মালতী ঘোষাল, রাজেশ্বরী দত্ত এবং আরও অনেকের পরে ঋতু গুহ অবশ্যই বোদ্ধা শ্রোতাদের কাছে এক বিশেষ আসনে আছেন। শুধুমাত্র গানই নয়, সম্ভ্রান্ততার জন্যই তিনি এক আলাদা আসনে আছেন এবং থাকবেন। ওঁর জন্যে ইনডোর স্টেডিয়াম বা সল্টলেক সিটির অডিটোরিয়ামে সংবর্ধনার বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন নেই, তিনি চিরদিন থাকবেন বোদ্ধা শ্রোতাদের হৃদয়ে। তাঁর সেই সম্মান এবং শ্রদ্ধার আসন খুব বেশি গায়িকা নিতে পারবেন না।

—আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করি।

পরক্ষণেই প্রসঙ্গ বদলে কুমুদিনী বলল, একটা প্রশ্ন বহুদিন হল করব ভেবেছি, কিন্তু করতে ভুলে গেছি আপনাকে।

—এখন করো।

—আপনার এই লালরঙা দিশি কুকুরটার নাম ন্যাওটা রাখল কে? তাছাড়া, একে আপনি পেলেন কী করে। মানে, কোথা থেকে?

—আমি পাইনি। এই বংশীবদনই এক কালীপুজোর রাতে একে বগলদাবা করে নিয়ে আসে। তখন এর বয়স হবে বড়ো জোর মাসখানেক। আশ্রমের কাছেরই একটি কদমগাছ তলাতে চিৎপটাং হয়ে সে পড়েছিল।

তার পর একটু থেমে ডাহুক বলল, ঐ বয়সী কুকুরদের সচরাচর একা দেখা যায় না। এবং সঙ্গে তাদের মাও থাকে। কিন্তু কোনও রহস্যজনক কারণে সে মৃতপ্রায় অবস্থাতে একলা গাছতলাতে পড়েছিল। রহস্য হয়তো অনেকই ছিল, কিন্তু একটি রহস্য বংশী উন্মোচিত করেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

—সেটা কী?

—শান্তিনিকেতনের তোমরা তো পুরনো বাসিন্দা। এবং ব্রাহ্ম। আমাকে ভুল বুঝো না যা বলব তাতে।

—রহস্য তো আপনি আরও ঘনীভূত করছেন। হচ্ছিল আপনার 'ন্যাওটা' নামক লাল দিশি কুকুরের কথা এর মধ্যে শান্তিনিকেতনের

প্রাচীন বাসিন্দা এবং ব্রাহ্মদের কী সম্পর্ক?

—এত বহিরাগতর ভিড় সত্ত্বেও এখানে অন্তঃসলিলা স্রোতের মতো ব্রাহ্ম প্রভাব ও প্রাধান্য এখনও আছে এবং সে সম্বন্ধে কট্টর ব্রাহ্মরা অত্যন্ত সচেতনও। ব্রাহ্মধর্ম যদিও হিন্দুদের মধ্যে অতি উত্তম যাঁরা, তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু এখনকার সব ব্রাহ্মরাই যে গর্ব করার মতো নন এ কথাও তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে একজনকে লিখেছিলেন 'হিন্দুধর্ম যদি মৃত হইত তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্মকে প্রসব করিতে পারিত না।' তবে সকলেই যে রবীন্দ্রনাথের মতো উদার হবেন তা তো প্রত্যাশার নয়।

—ডাহুকদা, এ যে দেখছি হেঁয়ালির পর হেঁয়ালি। কী বলতে চাইছেন একটু খোলসা করে বলুন।

—ধৈর্য ধরো। এখনই রহস্যর সমাধান হবে।

বলেই বলল, তুমি এখানের পটাশদার কথা শুনেছ? প্রচণ্ড কালীভক্ত। শাক্ত। কট্টর হিন্দু। তিনি ব্রাহ্মদের এই ছুপা মাস্তানি সহ্য করবেন না প্রতিজ্ঞা করে জাঁকজমক করে কালী পুজো করতেন আর তাঁর বাড়ির অদূরে সিঁদুর মাখানো রামদা নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘুরোতে ঘুরোতে বলতেন—আয় দেখি কোন শালা ব্রাহ্ম আছিস আমার মায়ের পূজা বন্ধ করবি?

—এতো পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া। বন্ধ করতে যাচ্ছেনই বা কে? ব্রাহ্মরা ওরকম অসভ্য হন না।

কুমুদিনী বলল।

—ঠিক কথা।

ডাহুক বলল।

—এখনও তো ন্যাওটা রহস্যর কূল-কিনারা পাওয়া গেল না।

—পাবে। ধৈর্য ধরো।—কালীপুজো যে মধ্যরাতে হয়, এ কথা তো জানো, তুমি হিন্দু না হলেও।

—এ কথা কে না জানে। আমার আব্রাহ্ম বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনও কম নেই।

—তা হল শোনো, পুজোর পরে কলকাতার চিনে বাজার থেকে আনানো বড়ো বড়ো বোম, বুড়িমার চকোলেট বোম, যে বোমের বিজ্ঞাপনে সুনীল গাঙ্গুলির ছবি থাকত, মুখে ব্যোম, ব্যোম শব্দ করতে করতে ফাটাতে শুরু করলেন। আর জানোই তো, বাজির শব্দে কুকুরমাত্রই আঁতকে ওঠে, সে অ্যালসেশিয়ান বা ডালমেশিয়ানই হোক কী দেশি নেড়ি। ন্যাওটার মা বাচ্চাদের নিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে পটাশদার বাড়ির কাছে পথের পাশে শুয়েছিল পুজোর পরে কিছু প্রসাদ টসাদ পাবে এই আশায়। ইতিমধ্যেই এই বিপত্তি। আওয়াজ শুনে যে যে দিকে পারল কুঁই কুঁই করে ভাগলবা। একটি বাচ্চার ছিল ভগ্নস্বাস্থ্য। সে একটি প্রকাণ্ড লাফ মেরে অদূরের কদমগাছ তলাতে পড়েই চোখ উল্টে একেবারে অজ্ঞান। সেই অবস্থাতে বংশীবদন পুজোমণ্ডপ থেকে সময়ে তাকে আবিষ্কার করে বগলদাবা করে বাড়ি নিয়ে আসে। তার পর পলতেতে করে দুধ খাওয়ায়, বুকে গরম তেল মালিশ করে করে তাঁকে পুনর্জন্ম দেয় এবং কুকুরছানাটি তার বড়ো ন্যাওটা হয়ে ওঠে। সেই জন্যেই তার নাম ন্যাওটা। ন্যাওটার লিঙ্গ স্ত্রী। বছরে একবার করে এই পাড়ারই কালোকে দিয়ে তাকে রমণ করানো হয়। কিন্তু বংশীবদন গোঁড়া বৈষ্ণব। বহুগামিতা হাইলি ডিসঅ্যাপ্রুভ করে। তাই ন্যাওটাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখে ও। ন্যাওটা এবং কালোর মিলনে ঝুড়ি ভর্তি বাৎসরিক ফসল লাল-কালো-সাদা মাদী-মদ্দা বাচ্চাদের পরম যত্নে একটু বড়ো করে তুলে পাড়াময় বিলি করে বংশী। আমাদের পাড়ায় ওরাই সিকিউরিটি গার্ড। বংশীর বুদ্ধিতে আমাদের এ-পাড়াতে গত আটবছরে কোনো চুরি হয়নি।

—শান্তিনিকেতনে চুরি তো হতো না। সে সব তো শুরু হয়েছে এই ক'বছর হল। কলকাতার বড়লোকরা এখানে এসে বড়লোকি দেখানো শুরু করার পরে।

ডাহুক বলল, সে কথা ঠিক। আমার এই পর্ণকুটিরেও তো হয়ে গেল প্রায় পনেরো বছর। গোড়ার দিকে চুরি-চামারির কথা শোনা পর্যন্ত যেত না।

কুমুদিনী বলল, কিন্তু এই পটাশবাবুটি কে? তাঁর কথা তো শুনিনি

কখনও কারো মুখো। আর ঐ রকম নামেরই বা কী মানে?

—পটাশ মানে, পটাশ পারমাঙ্গানেট। এখানের সব বাড়ির কুয়োর জলে চুন আর পটাশ পারমাঙ্গানেট দিতে হয় না বর্ষার সময়ে?

—হয়ই তা। কিন্তু তার সঙ্গে ওঁর কী?

—ওঁর কিছুই না। নিজের নাম তো আর নিজে রাখেননি। ওঁর বাবাই রেখেছিলেন। ওঁর বাবা কৈলাশ চট্টখণ্ডি। ছেলে যেন সকলের কাছে ইনডিসপেনসিবল্ হয় বড়ো হয়ে উঠে তাই ঐ নাম। পটাশ।

কুমুদিনী বলল, এমন উদ্ভাবনী প্রতিভা শান্তিনিকেতনেই সম্ভব। আর কী বলব! কত ফণীমনসা আর বেশরম-এর ঝাড় যে স্রেফ এখানের মাটির গুণে কাঁঠালিচাপা হয়ে গেল কী বলব! আমার বয়স কম হলেও কম তো দেখলাম না।

বংশীবদন দরজার টোকা দিল।

—কী চাই?

বলল, ডাহুক।

—চা, কফি কোল্ড ড্রিঙ্কস কিছু?

—বলো, কুমুদিনী।

—একটা স্প্রাইট খেতে পারি।

—আমি কিছু খাব না। একটু পরে হুইস্কি খাব। সব নিয়ে এসো বংশী, সাড়ে সাতটা নাগাদ।

—হ্যাঁ বাবু।

—রোজই কি খান?

—না। রোজ নয়। ইচ্ছে হলে। তবে আজকে যেমন আবহাওয়া। শান্তিনিকেতনের বর্ষাকালটা আমার ইহকালের মস্ত আরামের সময়। তার চেয়েও বড়ো কথা, আজ তুমি এসেছে। তুমি কি খাবে আমার সঙ্গে একটু?

—খাই না যে তা নয়, তবে আমি সোশ্যাল ড্রিঙ্কার। কিন্তু পুঁচকির ব্যাপারে আমার মাথার ঠিক নেই। আই ফিল লাইক গেটিং ড্রাঙ্ক টু নাইট। খাব। আজ খাব।

—তোমার উকিল কে?

—উকিল নয়, ব্যারিস্টার। জয়ন্ত মিত্র। উনি ডিভোর্স-এর কেস সচরাচর নেন না। কিন্তু অমিতদাকে ধরে রাজি করিয়েছি।

—কে অমিতদা?

—অমিত বোস। সলিসিটর। ভিক্টর মোজেজ কোয়ানির। দুজনেরই বাড়ি আছে এখানে। মিত্তির সাহেবের প্যালেস আর অমিতদার মিনি প্যালেস।

—এবারে বলো, কী বলার জন্যে ডেকে আনলে আমাকে।

—আমার কিছু বলার নেই। আপনি কিছু বলুন।

—তাহলে আমাকে ডাকলে কেন? ফোনেই কি বলা যেত না? তাছাড়া আমি কী বলব বলো? সেদিনও যা বলেছিলাম আজও তাইই বলছি। প্রথমেই এমন এক্সট্রিম স্টেপ নিও না। একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে অনেক সময়, অনেক যত্ন লাগে। আর তা ভেঙে ফেলতে লাগে এক মিনিট। তোমারা তো মুসলমান নও যে তালাক। তালাক। তালাক! বলে তিন তালাকে সম্পর্ক ভেঙে দেবে।

—সব শোনাব পরও আপনি এই কথা বলছেন কী করে। একজন ডাইনির সঙ্গে সাতদিন হেটেলে থাকবে দীঘাতে—তারপর কলকাতাতে ফিরে আমি যখন অফিসে তখন আমার মেয়েকে নিয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, তার সঙ্গে ঘর করতে বলেন আপনি? আমার কি কোনো চয়েস আছে? আমাদের এক কমন ফ্রেন্ড কাল রাতে ফোন করে জানাল, যে, সে নাকি শুনেছে যে, পুঁচকিকে নিয়ে স্বামী মালয়েশিয়ার চলে গেছে। সঙ্গে নাকি ডায়ানাও গেছে। কত কষ্ট করে ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলাম পুঁচকিকে। পড়াশোনাতেও মেয়েটা খুবই ভাল হয়েছে। তার এতদিন স্কুলে কামাই হচ্ছে—স্কুলেই বা আমি কী বলব? মেয়েটার কেরিয়ারই নষ্ট হয়ে যাবে। এ ছাড়া আমি কিই বা করতে পারতাম। আপনিই বলুন?

ডাহুক চুপ করে রইল।

তারপর বলল, আর একটু ধৈর্য ধরো কুমুদিনী। ধৈর্যর মতো বড়ো গুণ আর নেই।

—আপনাকে সব না বলেও উপায় নেই।

—কী না বলে?

—আমার সঙ্গে গত একবছর কোনো শারীরিক সম্পর্ক নেই।

—সে কী? এটা তো চিন্তার কথা! তোমাদের কীই বা বয়স। তাছাড়া, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অনেক ত বটেই, সব ডিফারেন্সই বিছানাতে রিজলভ্ড্ হয়ে যায়। সেখানেই যদি এমন গোলমাল হয়, তবে তো চিন্তারই কথা।

তারপর বলল, সম্পর্ক নেই কেন?

—তা বলতে পারব না। কিন্তু মনে হয় আমাকে ও ঘেন্না করে।

—ঘেন্না করে? তোমাকে? কিন্তু কেন?

—কেন? তা বলতে পারব না। ওর ধারণা আপনার সঙ্গে আমার কোনও গভীর সম্পর্ক আছে। আপনার ওপর ওর ভীষণই রাগ।

ডাহুক হেসে উঠল। বলল, আমার উপরে পৃথিবীর বহু মানুষেরই ভীষণ রাগ। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তাছাড়া, মনের সম্পর্ক তো চিরদিন গভীর হয়। যাদের গভীরতা নেই তাদের পক্ষে এইরকম সম্পর্কর তল পাওয়া মুশকিল। তা বলে, চোরের ওপরে রাগ করে তুমি মাটিতে ভাত খাবে কেন? স্বামীকে আমি কখনও প্রতিপক্ষ বলে ভাবিনি। ভাবলে,অনেক আগেই তোমাকে আমি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু কারো ঘর ভাঙাতেই আমি কখনও বিশ্বাস করিনি। আমি ঘরেও যেমন বিশ্বাসী, বারান্দাতেও তেমনিই বিশ্বাসী, দুঃখের বিষয়, এই ব্যাপারটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো মানসিকতা বা উদারতা কম নারী-পুরুষের মধ্যেই থাকে। থাকে না যে, এটা দুঃখের। খুবই দুঃখের।

—ও সাহিত্য-টাহিত্য কোনওদিনও পড়ে না। গানও শোনে না। ওর সঙ্গে আমার কোনওদিক দিয়েই কোনও মিল নেই। অথচ কী করে যে আমার আর ওর বিয়েটা হল তা ভেবে পাই না। বলেছিলাম তো আপনাকে গত রাতে যে, ও কী শরীরসর্বস্ব। আমাকে ও প্রায় জবরদস্তি করে প্রেগন্যান্ট করে দিল বলেই ত ওকে বিয়ে করতে বাধ্য হলাম। অ্যাবর্শন কী করে, কোথায় গেলে করা যায় তাও জানতাম না। আমি খুবই

কল্পনাপ্রবণ রোম্যান্টিক মেয়ে ছিলাম। অনেকেই বলতেন, আমি নাকি শান্তিনিকেতনের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রডাক্ট। নাচ, গান, ছবি আঁকা, সভ্যতা, সুরুচির সবেরই প্রতিমূর্তি ছিলাম আমি। সবাই বলত।

তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, রবীন্দ্রনাথের সেই একটা গান আছে না? "ফুল তুলিতে ভুল করেছি প্রেমের সাধনে"। আমার জীবনে এই কলিটিই সত্যি হল। শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ মেয়েই ভাল কিন্তু ছেলে সম্বন্ধে হয়তো সে কথা বলা যায় না। এমন কথাও অনেকে বলেন।

দরজাতে আবার টুকটুক হল।

আসব?

বংশী বলল।

এসো বংশী।

বংশী ট্রেতে গেলাস বসিয়ে তাতে স্প্রাইট ঢেলে নিয়ে এল।

—তোমার স্প্রাইট। সঙ্গে কিছু খাবে? কুরকুরে টুরকুরে?

বংশী বলল, আরামবাগের দোকান থেকে টেংরি কাবাবও এনে রেখেছি। গরম করে দেব মাইক্রোওভেন-এ?

—কুমুদিনী বলল, না, বংশীদা। পরে এসো, যখন ডাহুকদা হুইস্কি খাবেন।

ঠি—আছে।

বলল, বংশী।

এই অ্যাব্রিভিয়েশনের যুগে যখন সেকেন্ডকে এখনকার ছেলেমেয়েরা বলে 'সেক', পোলিটিকাল সায়েন্সকে 'পল সায়েন্স', দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সকে 'ডি স্কুল', তখন বংশীও বা ঠিককে 'ঠি' বলবে না কেন? সময়ের দাম হঠাৎই বড্ড বেড়ে গেছে। ডাহুকের মনে হয় যে, তারা বড় ব্যাকডেটেড হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে নয়। গেছে।

স্প্রাইটে চুমুক দিয়ে কুমুদিনী বলল, ক'দিন আছেন?

—কালই ফিরে যেতে পারি। তুমি অনুমতি দিলেই যেতে পারি। তোমার জন্যেই তো আসা। তাছাড়া, এই মুহূর্তে তোমার জন্যে আমার করণীয় খুব একটা নেইও। উ্য আর ইন সেফ হ্যান্ডস। আমি তো আছিই।

তোমার যখন দরকার তখনই একটা ফোন করে দিও।

—না, এসেছেনই যখন তখন কালকের দিনটা থেকেই যান। পরশু যাবেন।

—ঠিক আছে। তবে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসেই চলে যাব। ‘গণদেবতা’ তে গেলে চলবে না। সন্ধেতে অক্সফোর্ড বুক শপ-এ একটা বই উদ্বোধনের অনুষ্ঠান আছে।

—তা তো থাকবেই। আপনারা সেলিব্রিটি।

—হুঁ। সেলিব্রিটির সুখটাই সকলের চোখে পড়ে, দুঃখটার কথা শুধু তাঁরাই জানেন।

—জানি না। আমরা তো সুখটাকেই দেখি। গত সপ্তাহের ইংরেজি ইন্ডিয়া টু-ডেতে এখানের সেলিব্রিটিদের বাড়ির ফোটো ছাপা হয়েছে এবং তাঁদের ফোটোও।

—কার কার?

যোগেন চৌধুরি, কুমার রায়, বুদ্ধদেব গুহ এবং সুনীল গাঙ্গুলির। যোগেন চৌধুরির বাড়ি রতনপল্লীতে, আর সুনীল গাঙ্গুলি আর কুমার রায়ের বাড়ি ফুলডাঙাতে। ওঁদের স্ত্রীদের ছবিও ছাপা হয়েছে। বুদ্ধদেব গুহর বাড়িও রতনপল্লীতেই। তবে অন্যদের ছবি ছাপা হলেও বুদ্ধবের গুহর বা তাঁর স্ত্রী ঋতু গুহর ছবি ছাপা হয়নি। সম্ভবত তাঁরা তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। অবশ্য ওঁর বাড়িটাকে বাড়ি বলা যায় না, সেটা একটা কুটির। পূর্বোক্তদের বাড়িও বাড়ি নয়, প্রাসাদ।

—তাই।

—তাই।

—ফুলডাঙাটা কোনদিকে?

—প্রান্তিকের দিকে। আমরা আগে ঐ সব অঞ্চলকেই গোয়ালপাড়া বলতাম।

—হবে। আমি তো কূপমণ্ডুক। বাড়িতে এসে ঢুকি সাইকেল রিকশাতে আবার বাড়ি থেকে স্টেশনে যাই সাইকেল রিকশাতে। ওখানের কম মানুষকেই চিনি। মাঝে মাঝে শুধু ইন্দ্রদার সুবর্ণরেখাতে

যাই। ইন্দ্রদা, বউদি আর তাঁর ছোটভাই ব্যাচেলর বিমলের কাছে। সেখানে অবশ্য অনেক নামী মানুষরাই আসেন।

একটু থেকে ডাহুক বলল, আসলে, আমার চেনা-জানার বৃত্ত কলকাতাতে এতটাই বড় যে, আরও মানুষের সঙ্গে আলাপিত হতে ইচ্ছে করে না। কাজ করতে হলে, সে লেখাই হোক, কী ছবি আঁকা, অথবা গান গাওয়া বা শোনা হলেও যতখানি নির্জন হয়ে থাকা যায় ততই বোধহয় ভাল। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একসময়ে তাঁর কাছের একজন মানুষকে লিখেছিলেন, "নির্জনতা কখনওই খালি হাতে ফেরায় না।" শুধু উনিই নন, আমেরিকান ফাদার পোয়েট ওয়াল্ট হুইটম্যান, হেনরি ডেভিড টলস্টয় ইত্যাদি সকলেই নির্জনতার পূজারী ছিলেন।

তার পর বলল, তুমি কি সুইডিশ লেখক ন্যুট হামসুন-এর 'গ্রোথ অফ দ্যা সয়েল' বইটা পড়েছ? নোবেল প্রাইজ তিনি অবশ্য অন্য বইয়ের জন্যে পেয়েছিলেন, কিন্তু ঐ বইটি আমার বিশেষ প্রিয় বই।

—না, ইংরেজি বই আমি বিশেষ পড়িনি ডাহুকদা। তবে বাংলা সাহিত্য ভাল করে পড়েছি। বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকেই পড়েছি। বিভূতিভূষণের অরণ্যভিত্তিক লেখারই প্রশংসা করে সকলে, অবশ্য ন্যায্যতই করে, কিন্তু ওঁর লেখা একটি চটি উপন্যাস পড়েছিলাম—'দুই বাড়ি'। অমন মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস খুব কমই পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের কথা আর কী বলব? তাঁর লেখা, তাঁর গান, ছিন্নপত্রাবলী, বিভিন্ন নাটক, বিশেষত, মায়ার খেলা, রক্তকরবী আর রাজা আমার অসম্ভব প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ আমার মজ্জায় মিশে গেছেন আর স্বামী শান্তিনিকেতনে পড়েও পাঠভবনের পড়ার সময়েই সহজপাঠ আর 'শিশু ভোলানাথ' ছাড়া বিশেষ কিছু পড়েছে বলে জানি না। খেলাধুলোতে খুব ভাল ছিল। ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিল। ওর 'স্পোর্টসম্যান' ইমেজের জন্যে শান্তিনিকেতনের অনেক মেয়েও ওর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কী ছেলে বা মেয়ে, অনেকেই যদি কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা হলে তার প্রতি কেউ কেউ আকৃষ্ট হওয়ার কোনও কারণ না থাকলেও প্রতিযোগিতাতে জয়ী হওয়ার জন্যেই তাকে

জয় করতে চায়। ওর সঙ্গে মিল বলতে আমার কিছুমাত্র না থাকলেও ওর পেটা চেহারা, ছ'ফিট দৈর্ঘ্য ও পুরুষালি হাবভাব দেখে এবং অন্য মেয়েদের হারিয়ে দেওয়ার জন্যেই আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হই। ওরও হয়তো আমার মতো 'মেয়েলি মেয়ে' কে চরিত্রর বৈপরীত্যর কারণেই শুধু ভালই লাগে না, আমার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে। সেই উন্মাদনার পরিণামই সেই অসময়ের দুর্ঘটনা।

তারপর বলল, আমার মায়ের তো ওর ওপরে এক অশেষ দুর্বলতা ছিলই, কারণ ও তাঁর সন্তান।

—কী বলছ তুমি?

—ঠিকই বলছি। আমার মা যদি অন্য কোনও মহিলা হতেন তবে হয়তো এই অসম মানসিকতার বিয়েতে রাজিই হতেন না। সে কারণেই মায়ের শরীর খারাপ বলে দৌড়ে দৌড়ে কলকাতা আসি বটে কিন্তু মায়ের প্রতি আমার আর কোনও ফিলিংস নেই।

—সে কী?

—সত্যিই নেই। ডাহুকদা আমাদের জীবন বড়ো বিচিত্র। আমরা সত্যিকে সবসময়েই গোপন করে রাখতে চাই, তাই আমাদের বেশ সুন্দর ও শোভন বলে মনে হয়। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে সত্যিই গোপন করাটা উচিত নয়। আজকাল সহজ, আনসফিসটিকেটেড, স্বাভাবিক, এমনকী, আপাতদৃষ্টিতে রুক্ষ এবং হয়তো অসামাজিক হওয়াটাই প্রকৃত সভ্যতা। একটাই জীবন—এই জীবনে অভিনয় করার সময় সেই। পরিয়ায়ী হাঁস যেমন বহু দূরদেশ থেকে উড়ে এসে ঝপাং করে জলে পড়ে চতুর্দিকে জল ছিটকে, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত জীবনের জলে ওমনি ঝপাং করেই আছড়ে পড়া With a bang! জীবনে বাঁচা এবং মরা দুই-ই অমনিভাবেই আলিঙ্গন করা উচিত।

তারপর বলল, আপনি আন্তোনিওনির লা ডোলচে ভিতা ছবিটা কি দেখেছেন?

—দেখেছি বইকি। সে তো বহু পুরনো ছবি। এই ইতালিয়ান পরিচালকের ছবি তো বটেই, ওঁর ব্যক্তিত্বও আমার খুবই ভাল লাগে।

—ওঁর ঐ ছবিতেই তো প্রথম জানি "টু ডাই উইথ আ ব্যাঙ্গ অ্যান্ড নট উইথ আ হুইস্পার"-এর বাণী। তখন অবশ্য আমার বয়স খুবই কম। ঐ ম্যানডেট এর মানে তখন যে পুরোপুরি বুঝেছিলাম এমনও নয়।

—ওঁর ছবিতে দেখা যেত অনেক নায়ক-নায়িকাই আত্মহত্যা করতেন। একটা বই পড়েছিলাম ওঁর উপরে লেখা। তাতে আছে যে এ বিষয়ে ওঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়, কেন ওর নায়ক নায়িকারা আত্মহত্যাপ্রবণ? উনি উত্তরে বলেছিলেন, "ইফ লাইফ ইজ আ গিফ্‌ট অফ গড, দ্যা রাইট টু টেক ইট অ্যাওয়ে ইজ অলসো আ গিফ্‌ট অফ গড।"

—তাই?

—হ্যাঁ।

—কীসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি ডাহুকদা বাগান থেকে।

—জানালাটা খুলে দাও। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা করে আছে আর উথাল পাথাল হওয়া। কলকাতাতে তো প্রলয় এসেছে। আজ বৃষ্টির ছাঁট এলেও দরজা জানালা খুলে রাখার দিন, মনের দরজা জানালাও।

—দিচ্ছি খুলে।

—বলে কুমুদিনী তার সোফা ছেড়ে উঠে সবকটি জানালা দরজা খুলে দিল। অধিকাংশেরই মুখ বাগানের দিকে।

—সন্ধে হতে এখনও কিছু দেরি আছে। লক্ষ করে দেখেছি যে শান্তিনিকেতনে বছরের এই সময়ে সন্ধে হয় সাতটা নাগাদ। এমন আমার পাখি দেখার সময়।

—তাই? কী কী পাখি আছে আপনার বাড়িতে? আমাদের বাড়ির দিকটা এখন ন্যাড়া হয়ে গেছে। কিছু বড় বড় পুরনো গাছ ছাড়া অন্য গাছ নেই-ই। পাখি যে নেই তা নয় কিন্তু এত লোকজনের আনাগোনায় যে পাখিরা আরাম পায় না। এই গন্ধটা কোন ফুলের?

—ম্যাগনেলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা। পাহাড়ি ফুল তবে সমতলেও ফোটে। সাদা, বড় বড় ফুল, মিনি স্থলপদ্মর মতো। যাও না, দেখে এসো, এখন ফুটেছে।

—এখন উঠতে ইচ্ছে করছে না এই ঘর ছেড়ে।

—কেন?

—মনে হচ্ছে এই ঘরে অনেক শান্তি, সান্ত্বনা, স্বস্তি। আর মনে হচ্ছে যেন জঙ্গলের মধ্যে বসে আছি।

ডাহুক বলল, একবার আলমোড়া থেকে আলমোড়ার বাঙালি হেল্‌থ অফিসারের সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে গেছিলাম বড়েছিনা হয়ে পানুয়ানালা। তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। গরমের দিন। পূর্ণিমার রাত। সারাদিন হেঁটে সন্ধের মুখে মুখে গিয়ে পৌঁছলাম পানুয়ানালাতে। ডাকবাংলোয় বারান্দার ডেকচেয়ারে বসে যখন ফোস্কা পড়ে যাওয়া পায়ের পরিচর্যা করছি তখন নিচের গভীর জঙ্গলময় উপত্যকা থেকে অগণ্য ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার গন্ধ উঠে আসেছিল। তখন একটি হলুদ থালার মতো চাঁদটাও উঠছিল কুমায়ুঁ হিমালয়ে পানুয়ানালা বাংলোর সামনের কৈলাসের পথের উপর। সে যে কী দৃশ্য। আর কী গন্ধ।

একটু চুপ করে থেকেও, স্মৃতিমন্থন করে ডাহুক বলল, গন্ধে অভিভূত হয়েছি বহুবার, কিন্তু পানুয়ানালার উপত্যকার ম্যাগনেলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার গন্ধে যেমন অভিভূত হয়েছিলাম তেমন আর কখনও হইনি। ম্যাগনোলিয়ার সঙ্গে সেই প্রথম প্রেম আমার চিরস্থায়ী হয়েছে। তাই বেশ কয়েকটি ম্যাগনোলিয়া লাগিয়েছি এই বাগানে।

—কুমুদিনী বলল, কী কী গাছ আছে আপনার বাড়িতে? ঠিক এই সময়ে কখনও আসিনি আপনার এখানে। মোটে তিনবারই।

—আমার এই পর্ণকুটিরকে কি বাড়ি বলে? এ তো বাগানই মাঝে এক চিলতে মাথা গোঁজার ঠাঁই শুধু।

—ডাহুক হেসে বলল, এক বুড়ো ডাহুকের বাসা। একা। ডাহুক ডাহুকী নেই।

—গাছ বলতে কনকচাঁপা, ফলসা, নলি বাঁশ, ছত্তিশগড়ের অচানকমারের জঙ্গল থেকে আমার এক পাঠক এনে দিয়েছিল। চার-পাঁচটা ঝাড় আছে। ম্যাগনোলিয়া, বললাসইত। আরেক পাঠক এনে দিয়েছিল সুন্দরবন থেকে সুন্দরী। যদিও সুন্দরবনের নোনা জলের

এলাকার গাছ কিন্তু সুন্দরী সব জায়গাতেই হয়। অনেকেরই জানা নেই এই তথ্য। আর আছে বসন্তি।

—বসন্তি কী গাছ?

বড় গাছ, বসন্তোৎসবের আগে ও পরে ফুল ফোটে। তবে, বসন্তেরই মতো এদের ফুল অচিরা। ফোটার পরে গাছ থাকে না। এক দুদিন পরেই ঝরে যায়। হালকা হলুদ রং। তবে গন্ধ নেই। রবীন্দ্রনাথের গান আছে না? "একলা বসে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তি রঙ দিয়া, খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী মৌমাছি ঐ গুঞ্জরে বন্দিরা।" সেই বসন্তি।

—তাই তো!

—আর আছে নানা সুগন্ধি লতা আর নানা রঙের বোগেনভেলিয়া। বংশীর লাগানো কিছু পেঁপে, আর মুসম্বি, অজস্র গন্ধরাজ লেবু৮ লালপাতিয়া, মুসাণ্ডা, এরাই সব রাঙিয়ে রাখে। কিছু কৃষ্ণচূড়াও আছে। আছে জ্যাকারান্ডা। আর আছে একটি ফলসা। ফল এখন ঝরে গেছে। বর্ষার গোড়াতে এসেছিল। আবারও আসবে।

—কখনও দেখিনি ফলসা।

—কাল দিনমানে এসো, তোমাকে দেখিয়ে দেব ফলসাগাছ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে না?

"গৌরবরণ তোমার চরণমূলে
ফলসাবরণ শাড়িটি ঘেরিবে ভালো—
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘনকালো।"

ফলসার রং ম্যাজেন্টা আর বেগুনির মাজামাঝি। আমার খুব প্রিয় রঙ। আমার ছবিতে আমি প্রায়ই ব্যবহার করি এই রং। কুসুম গাছ ছিল একটা। মরে গেছে। কুসুমের গাছে যখন নতুন পাতা আসে তখন যারা এই গাছ চেনে না তাদের মনে হতে পারে যে ফুল এসেছে। চিকন মসৃণ পাতাগুলোর রঙ এমন লাল যে মনে হয় মাছের রক্ত ধোয়া জলের মতো। এই রংও আমার ছবিতে আমি ভালবেসে ব্যবহার করি।

তারপরে বলল কয়েকটি পলাশও লাগিয়েছি। পলাশ না হলে কি শান্তিনিকেতনের বাড়ি মানায়? কয়েকটা মাদার আছে, লাল ফুল ফোটে আর জারুলও আছে কয়েকটা। বেগুনি ফুল ফোটে।

—আর পাখি? কী কী পাখি আসে আপনার বাগানে?

—আসে তো বটেই, থাকেও। পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট।

বলেই বলল, এবার উঠে জনালা দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। জঙ্গল বলেই মশাও আসবে অন্ধকার হওয়ার আগে। তার পর স্বগতোক্তির মতো করে বলল, এক একটি বড় গাছ আমাদের মায়ের মতো এবং ছোট গাছেরা সব সন্তান। তোমার পুঁচকির মতো।

কুমুদিনী বলল, খুব ভাল বলেছেন। তবে আজকে মশা আসবে না। এখন সুন্দর সুগন্ধি হাওয়া বইছে সারা দিন। আজকে কোনও উপদ্রবেরই উপায় নেই। এবারে আপনার বাগানের পাখির কথা বলুন।

—পাখি বলতে, যাঁরা রেসিডেন্ট, তাঁরা হলেন ছাতারে বা সেভেন সি স্টারস। অভাবনীয় জীবনীশক্তিতে ভরা ছাই রঙা শরীরগুলো নিয়ে সর্বক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি চেঁচামেচি করছে। ইংরেজিতে তাদের নাম ব্যাবলারস। ডাহুক আছে, নাগচম্পার উঁচু ডালে, কখনও কখনও নেমে এসে ঝাঁকড়া দেবদারুর ডালে বাসা বাঁধে। প্রতি বছর এই সময়ে বাচ্চা দেয় তারা। তবে সব বাচ্চা বাঁচে না। তিন চারটি বাচ্চার মধ্যে একটি দুটি গাছ থেকে পড়েই মারা যায়। চার পেয়ে বিড়াল জাতীয় জন্তুরা যেমন বাচ্চাদের ঘাড়ের চামড়া কামড়ে ধরে তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে সহজেই স্থানান্তরিত করে, তেমন সুবিধা পাখিদের নেই। মায়ের চোখের সামনে বাচ্চারা অসহায়ের মতো মারা যায়।

—আমার চোখের সামনে যেমন পুঁচকি মারা যাচ্ছে। ওর জীবনে যা ঘটেছে তাও তো মৃত্যুরই সমান।

কুমুদিনী বলল।

একটু চুপ করে থেকে কুমুদিনী বলল, মনটা হঠাৎ ভারি খারাপ হয়ে যায় ডাহুকদা। ওর গায়ের বেবি জনসন পাউডারের গন্ধ নাকে ভেসে আসে, ওর আধো-আধো কথা, মাগো। বলে গলা জড়িয়ে কোলে ওঠা।

একটু চুপ করে থেকে বলল, অপত্য, দাম্পত্যর চেয়ে অনেকই গভীর বোধ। তাই বোধহয় স্বামীর চেয়ে ওর ওপরে টান আমার অনেক বেশি—আমার মায়েরও যেমন—তাঁর সন্তান 'স্বামীর' ওপরে টান।

—তুমি যাবে না মায়ের কাছে?

—না। এখন থাকব আপনার কাছে। মায়ের উপরে আমার ভীষণ রাগ ধরে। এবারে আসার পরে বিশেষ করে। তাছাড়া গিয়ে করবটা কী? আপনাকে তো আগে বলিনি, মায়ের পার্কিনসনস ডিজিজ হয়েছে। করার তো কিছু নেই। কাছে থাকলেও বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকেন শুধু। নার্স আছে চব্বিশ ঘন্টা। তাঁর ছেলেই তাঁকে দেখে না, আমি কী করব। তাছাড়া, বললামই তো আমার কোনও ফিলিংস নেই তাঁর উপরে আর। আমার জীবনটা সব দিক দিয়ে নষ্ট করার মূলে ঐ মহিলা। আমার বাবা ভারি ভাল মানুষ ছিলেন। ভারি ধার্মিক এবং প্রগাঢ় পণ্ডিত ব্রাহ্ম। আমার মা যে তাঁর সঙ্গে এমন করবেন তা তাঁর দুঃস্বপ্নেও ছিল না।

এমন সময়ে দরজাতে টুকটুক। বংশীবদন ট্রেতে করে সাজিয়ে একটি হোয়াইট লেবেল হুইস্কির বোতল, বরফ এবং একটি গ্লাস নিয়ে এল। অন্য প্লেটে টেংরি কাবাব। জলের জাগ।

—আরেকটি গ্লাস নিয়ে এসো। আর কটা বোতল আছে?

আরও তিনটে আছে। গতবারে ছটি নিয়ে এসেছিলেন।

—ঠিক আছে। কাম্পারি আছে?

—আছে দু বোতল।

—ভদকা?

তাও আছে দেড় বোতল।

—জানালাগুলো আর বাগানের দিকের দরজা দুটো বন্ধ করে দিয়ে যাই?

—দিদি বলছেন, আজ নাকি মাশা নেই।

—মশা নেই। কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে তো। মাঝে মাঝে। বর্ষাকাল। পোকা-মাকড়ও আসবে।

ডাহুক হেসে বলল, কীড়ে-মাকড়ে।

—বাগান দেখার জন্যে অবশ্য বন্ধ করলেও ক্ষতি নেই। দরজাগুলো তো কাঁচেরই। তাও একেবারে মাটির সমতা থেকেই। ঘরের বসেও মনে হয় বাগানেই আছি। সত্যি। এরকম ঘর সিনেমাতে দেখা যায়, তাও বিদেশি সিনেমাতে।

—শান্তিনিকেতনে আপনার বাড়ির মতো রিয়্যাল জংলি বাড়ি বেশি নেই, কুমুদিনী বলল।

এখন আর আমাদের দেশে আর বিদেশে তফাত তো বিশেষ নেই। প্রতি পরিবারের ছেলেমেয়েরাই বিদেশে যাচ্ছে পড়তে বা চাকরি করতে— বিশ্বায়ন এখন সর্বব্যাপী। তোমরাও জীবনযাত্রায়, মানসিকতায়, পোশাকে আশাকে অ্যামেরিকান, ইয়োরোপিয়ান হয়ে গেছো। আমার পর্ণকুটিরের দরজা জানালা কী দোষ করল বলো?

—দোষের কথা তো বলছি না, গুণের কথাই বলছি। দুর্দান্ত আপনার ইমাজিনেশন। পর্দা টানলেই প্রাইভেসি অটুট রইল আর খুলে দিলেই বাগানটা আকাশ শুদ্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

—এবারে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর করে তাতেই স্টাডি করব আমার। উপরটাতে মোটা কাঁচের শিট থাকবে আর তিন-চতুর্থাংশ থাকবে মাটির তলাতে। মনে হবে বাগানের মধ্যে লেখাপড়া করছি বা ছবি আঁকছি। আমার বন্ধু আর্কিটেক্ট মিহির মিত্র আর দুলাল মুখার্জিকে আইডিয়াটা দিয়েছি। ওঁরা দুজনেই প্ল্যানটা নিয়ে অনেকটা এগিয়েও গেছেন। যাতে জল, পোকামাকড়, ব্যাঙ, সাপ এসব না ঢুকতে পারে তারই ফুল-প্রুফ চেষ্টা চলছে।

বংশীবদন আর একটা গ্লাস নিয়ে এলে ডাহুক কুমুদিনীর জন্যে একটা ছোট হুইস্কি বানিয়ে দিল।

কুমুদিনী বলল, ছোট নয়। বড়ো বানিয়ে দিন। বলেছি না, আজ আমি ড্রাঙ্ক হব।

—প্রথম থেকেই ড্রাঙ্ক হবার জন্যে ধনুকভাঙা পণ করে লাভ নেই। হুইস্কি তো মানুষে হাল্কা হবার জন্যে খায়, খুশি খুশি লাগে বলেই খায়, কুস্তি করার জন্যে তো খায় না।

—খুশি খুশি লাগে বুঝি?

—হ্যাঁ। আমার ছোট বোনের খুবই অল্প বয়সে বিয়ে হয়। চলে যায় ইংল্যান্ডে ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে। সে সেখান থেকে যখন প্রথমবার দেশে আসে তখন হোয়াইট হর্স এর প্রেস্টিজ ব্রান্ড 'অ্যানসেস্টর' সঙ্গে করে নিয়ে আসে চার বোতল। চারকোনা দেখতে সবজে সবজে বোতল। অত স্মুথ হুইস্কি জীবনে খাইনি—অবশ্য সেই আমার প্রথম হুইস্কি খাওয়া। তিতির বলেছিল খা দাদা, দেখবি কেমন খুশি খুশি লাগে। সেই আমার চরিত্রনাশ। অ্যানসেস্টর পরে কিনেও খেয়েছি, কিন্তু আজকাল কোথাওই পাই না। তাজ, গ্রান্ড, হায়াত বা আইটিসির সোনার বাংলার কোনো 'বার' এই পাওয়া যায় না। বিদেশে গেলেও দেখতে পাই না। পেলে, তোমাকে খাওয়াতাম, দুজনে বসে সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে বা গান গাইতে গাইতে বোতল শেষ হয়ে যেত—একটুও নেশা হত না।

—আমি তো নেশা করার জন্যেই খেতে চাই। নেশা না হওয়ার জন্যে নেশা করে লাভ কী?

—নেশার সমুদ্র পার হয়ে অথবা সেই সমুদ্রের মাঝামাঝি এসে যে বেগুনি দ্বীপে পৌঁছবে যেখানে জানবে নেশা করেও নেশাগ্রস্ত না হবার সুখ। নেশাগ্রস্ত হয়ে মানুষ খারাপ কাজ করে। তেমন নেশা ভদ্রলোকদের জন্যে নয়। তোমার মতো একজন জেনুইন পার্সন এবং কমপ্লিট উওম্যানের জন্যে ঐরকম ছোটলোকি নেশা করা মানায় না।

—তারা কী খারাপ কাজ করে?

—খুন করে, ধর্ষণ করে, মার্ডার অ্যান্ড রেপ।

—আমি আজ দুইই করব। আই ওয়ান্ট টু গেট লস্ট।

—কাকে মার্ডার করবে?

—স্বামীকে।

—আর রেপ করবে কাকে?

—আপনাকে।

—মাই গুডনেস। জোক অফ দ্য ইয়ার।

তড়িঘড়ি হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে, এক চুমুকে গ্লাস খালি করে দিয়ে

কুমুদিনী বলল, ইটস নট আ জোক। উই উইল সী। আই ড্যু মীন ইট।

—আমার ভয় করছে কুমু।

—আমাকে কুমু বলে ডাকবেন না। কুমু বললে, রবীন্দ্রনাথের কুমুর কথা মনে পড়ে যায়। আমি সেই কুমু নই, ভ্রষ্টা কুমু।

—আজকে তুমি আমাকে রেপ করতে চাইছ আর গত বছর বসন্তোৎসবে তুমি যখন এখানে এসেছিলে তখন তুমি আমাকে অপমান করছিলে। আমার নিজের লেখা স্বাক্ষরিত বই তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, স্বামীকে, মানে তোমার স্বামীকে দুপুরে ভদকার নেমন্তন্নও পাঠিয়েছিলাম। তুমি বইটি পেয়ে একটা ফোনও করেনি। তার পরে আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগও রাখোনি।

—হ্যাঁ। রাখিনি। কিন্তু কেন রাখিনি আপনি জানেন না?

—জানি। কিন্তু আমার কি অত বড় অপরাধ হয়েছিল? আমি একজন লেখক, আমি চিত্রী, আমি গায়ক, আমাকে লক্ষ মেয়ে প্রেম নিবেদন করেছে আজ অবধি, কিন্তু আমি করেছি শুধুমাত্র কয়েকজনকেই। ন্যায্য কারণে আমার নিজেকে নিয়ে গর্ব আছে। তুমি সেই গোখরো সাপের মতো গর্বর মাথায় সজোরে পদাঘাত করেছিলে। তোমার গত বছরের জন্মদিনে তোমাকে কণিষ্ক থেকে একটি শাড়ি কিনে পাঠিয়েছিলাম। তুমি খুশি হয়েছিলে। ফোন করে বলেছিলে গরদের শাড়ি আমার অনেক আছে, কিন্তু ঠিক অমনটি একটিও নেই। খুব পছন্দ হয়েছে আমার। তোমার এ উদাসীনতার জন্যেই, নাকি অপমানই বলব? তোমার এবছরের জন্মদিনে তোমাকে আমি উইশ পর্যন্ত করিনি।

—আপনি বসন্তোৎসবের দিন ভোরে ফোন করে কী বলেছিলেন, মনে আছে?

—মনে আছে। ডাহুকের মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল আর কুমুদিনী তীক্ষ্ণ চোখে ডাহুকের মুখে চেয়েছিল এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে।

—কী বলেছিলেন? বলুন।

—বলেছিলাম, তুমি এসেছ বসন্তোৎসবে? বাঃ কী মজা আমার। তুমি আমার সামনে বিবসনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি আমি

তোমার পায়ের কাছে বসে তোমার কাঠবিড়ালিটি দেখব।

—আমি উত্তরে কী বলেছিলাম?

তুমি বলেছিলে, ঈসস। এমন এক সুন্দর দিনের সকালে কী অসভ্য কথা! বলেই ছেড়ে দিয়েছিলে ফোন।

তারপর বলল, তার আগেও একদিন একটি অনুষ্ঠানে আমাকে জিনস পরা দেখে আপনি বলেছিলেন, প্লিজ, কুমুদিনী, তুমি জিনস পরো না। বলেননি? আরও কী বলেছিলেন?

কুমুদিনী হাসতে হাসতে বলল।

—বলেছিলাম, তোমার উরু দুটি কী সুন্দর। কালিদাসের বর্ণনাতে যেমন কদলীকাণ্ডবৎ উরুর উল্লেখ আছে ঠিক তেমনই। বলেছিলাম, তুমি জিনস্ পরলে আমার গা শিরশির করে। তুমি কী সুন্দর কুমুদিনী। তোমার কাঠবিড়ালিটি আমাকে দেখাবে একদিন?

—আমি কী বলেছিলাম?

—বলেছিলে, তুমি হেসে বলেছিলে, আপনি ভারি অসভ্য।

—ঠিক তাই।

—আর আজকে তুমি আমাকেই রেপ করতে চাও?

—চাই।

একটু চুপ করে বলল, চাই। চাই। চাই। আমি কুমুদিনী, আমি সাধারণ নই, অসাধারণ। অসাধারণ। অসাধারণ চাওয়া পাওয়া। একদিন যা চাই না, অন্যদিন তাই চাই। তাছাড়া আপনাকে তো বলেইছি আমি। গত একবছর অরমিতা। আমি রমিতা হতে চাই।

এমন সময়ে গেট এর কাছে ন্যাওটার হুহুংকার শোনা গেল। গেট খোলার শব্দও শোনা গেল।

বংশীবদন এসে বলল, সোনার তরী থেকে স্বপনকুমার ঘোষ এসেছেন সস্ত্রীক। এই স্বপনবাবুই কি রায়গঞ্জ থেকে তুলাইপাঞ্জি চাল এনেছিলেন আপনার জন্যে?

—হ্যাঁ। উনিই। কিন্তু ফোন তো করে আসেননি। তুমি বলোনি যে আগে ফোন না করে এলে আমি কারো সঙ্গেই দেখা করি না।

—বলেছিলাম বাবু, কিন্তু স্বপনবাবু বললেন, আপনার মোবাইলে করে ছিলেন, কিন্তু মোবাইল বন্ধ ছিল।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ছিল।

জাপানে গেছিলেন স্বপনবাবু, আপনার জন্যে দুটি কলম আর একবাক্স পেনসিল এনেছেন সেখান থেকে। আর সুগন্ধি মোমবাতি।

—জাপানি সুগন্ধি মোমবাতি আর হাতপাখা তো উনি মহিলাদের জন্যেই আনবেন বলেছিলেন, ভারি সুন্দর। তা আমাকে মোমবাতি কেন? বলো, কলমগুলো আর পেনসিলের বাক্সটি রেখে যেতে। আর, অবশ্যই ফোনে কথা বলতে বোলো কাল সকালে। আর কিছু মনে করতে মানা কোরো। এখন দেখা করতে পারছি না। স্বপনবাবু খুব ভাল লোক। আমাকে জানেন। রাগ করবেন না।

বংশী চলে গেলে, কুমুদিনী বলল, পাখির কথা তো সব বললেন না।

—হ্যাঁ। বুলবুলি আসে, সিপাহী বুলবুল এবং স্ত্রীধন। টুনটুনি। ফিঙে। কোকিল। বসন্তর কোকিল অথবা পাঞ্জাবের ফসলি বটের এর দুর্নাম শান্তিনিকেতনের কোকিলদের দিতে পারবে না। তারা প্রায় বারো মাস কুহু কুহু করে তাদের জাতির ঐ দুর্নাম ঘুচিয়েছে। টিয়া আসে কর্কশ ডাক ডাকতে ডাকতে, শান্তিনিকেতনের অনেক ভিজিটিং প্রফেসরদের মতো। নানারকম মৌটুসকি আসে। আসে বড় বড় বাদামি কালো ক্রো-ফেজেন্ট। অনেকে তাদের বলে বন-কাওয়া। কাঠঠোকরাও আসে, নানারকম শালিখ আসে। পিউ কাঁহা কুচিৎ পায়রা। আর ঘুমপাড়ানি ঘুঘুরা তো সারা বছরের রেসিডেন্ট।

এমন সময় বংশী দরজায় টুকটুক করল।

—এসো বংশী।

—বাবু জিনিসগুলো?

—রেখে দাও। পরে দেখব।

—আর আজকে আরও দু থলে নিয়ে এসেছে সন্তোষ আর বাপী।

—কী এনেছে? থলে করে?

—ব্যাঙ। কটুরে কিছু আছে কোলা কোলা ব্যাঙ আছে বেশ

কয়েকটি। কুটুরেরা তো গাছে চড়বে। সোনা ব্যাঙও আছে একটি। হলু রং।

—ওদের পয়সা দেবার পরে ব্যাঙগুলোকে ছেড়ে দাও। দাম দিয়ে কিনেছে?

—নাঃ মাঠ ঘাট থেকে ধরে এনেছে। বকশিস দিলেই হবে। তবে কাজটা ভাল করলেন না বাবু। সাপ আসবে ওদের খেতে। কিছু তো আছেনই।

—ব্যাঙ?

অবাক এবং ঘেন্নার গলাতে বলল, কুমুদিনী।

—ইয়েস। ব্যাঙ। আমার এই বর্ষার বাগানে ঐ একটাই খুঁত ছিল। তাই এবারে এসেই বংশীকে বলেছিলাম, যেখান থেকে পারো ব্যাঙ জোগাড় করো। রাতে অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়বে আর বৃষ্টি থামলে ব্যাঙ ডাকবে না, তা কি হয়। তাছাড়া, তুমিই না বলেছিলে আমাকে ব্যাঙ দেবে।

কুমুদিনী চুপ করে রইল।

—সবশুদ্ধ কটা দিয়েছে ওরা বংশী?

—পনেরোটা।

—ফারস্ট ক্লাস। সামনে ঐ বাঁশঝাড়গুলোর পাশে একটা ছোট পুকুর খোঁড়াও বংশী। ব্যাঙদের সুবিধা হবে। পোকা মাকড় খেতে পারবে। পাখিদেরও বার্ড-বাথ হবে।

—সেই পুকুরে ল্যাটা আর তেলাপিয়া ছাড়ব বাবু? তা হলে আমরাও খেতে পাব।

—আরে আগে পুকুরটাই খোঁড়ো। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। বংশী চলে যেতেই ডাহুক উদ্বিগ্ন গলাতে বলল, তুমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কুমু, একি খেজুরের রস? ঢালছ আর খাচ্ছ। মারাত্মক ড্রাঙ্ক হয়ে যাবে।

—আমি তো বলেইছি যে আজকে আমি মারাত্মক ড্রাঙ্ক হব বলেই আপনার কাছে এসেছি। আপনার যদি আপত্তি থাকে তা হলে আমি চলে যাচ্ছি। শান্তিনিকেতনে আমার ড্রাঙ্ক হবার জায়গার অভাব নেই।

আপনাকে ভরসা করা যায় ভেবেই এসেছিলাম। এখন দেখছি আপনি আমার সম্পদ নন, বিপদ। আর আবারও বলছি, আমাকে কুমু বলে ডাকবেন না।

ডাহুক চুপ করে কুমুদিনীকে লক্ষ্য করছিল। অনেকক্ষণ চুপ করেই রইল। তার পর বলল, শুনছো তো অনেকক্ষণ ধরে খুব জোরে মেঘগর্জন হচ্ছে। রিকশা করে এসেছো, ভিজে একশা হয়ে জ্বর-জারি বাধাবে। দেখছি তোমাকে স্বপনদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। ওর গাড়ি করে নামিয়ে দিত।

—না। অমি যাব না। আমি আরও খাব।

—নিজেকে এমন করে হারিয়ে ফেলা কি ভাল? তাছাড়া, স্বামী হয়তো ফিরে তোমাকে ফোন করবে, হয়তো পুঁচকিকে নিয়ে সে চলে গেছিল তোমাকে একটু শিক্ষা দিতে! হয়তো নিজে থেকেই ও ফিরিয়ে দেবে পুঁচকিকে। কে বলতে পারে।

—ঈসস। ভারি আমার শিক্ষক এসেছেন আমাকে শিক্ষা দিতে। বাজে লোক একটা। একটা ডিবচ। একটা স্কাউন্ড্রেল।

ডাহুক চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, সে মানে স্বামী কিন্তু এখনও তোমার স্বামী। তোমাদের ডিভোর্সও হয়নি।

—স্বামী না ছাই! স্বামী! আমি আপনার মতো স্বামী চাই। আমি বিয়ে করব আপনাকে।

—এই রে। মাথাটা একেবারে গেছে দেখছি।

কুমুদিনী আরও একটা ঢালল নিজের গ্লাসে। এবারে পাতিয়ালা।

—তুমি এরকম করলে কিন্তু সাইকেল রিকশা করে বাড়ি ফিরতে পারবে না। বৃষ্টির কথা বাদ দিলেও তুমি পড়ে যাবে রিকশা থেকে।

—আমি আজ যাবই না। আমি থাকব আপনার কাছে আজ রাতে।

—তা কী করে হয়। পুরো শান্তিনিকেতনে ঢি ঢি পড়ে যাবে। গ্লাসে একটু জল মিশিয়ে বলল, শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যাদের আজও রোম্যান্টিক অথবা আশ্রমাইট ধারণা আছে তারা শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কোনও খবরই রাখে না।

—তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। আমি কিংবা তুমি আশ্রমিক বা আশ্রমবালিকার মতো ব্যবহার না করলেই যে এখানের শুচিতা নষ্ট হয়ে গেছে এ কথা বলা অন্যায়। তাছাড়া, ভুলে যেও না, এখানে এখনও অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন, জ্ঞানী গুণী,পণ্ডিত সব মানুষ, যাঁরা আজও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বিশ্বাস করেন। তাছাড়া, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরাও অনেক আছে যারা সেই আদর্শে বিশ্বাসী। এখনও সারা পৃথিবী থেকে এই আদর্শে শ্রদ্ধা নিয়েই কত ছেলেমেয়ে এখানে পড়তে আসেছে—কলাভবনে ছবি আঁকা শিখছে, সংগীত ভবনে গান শিখছে, বিদ্যাভবনে পড়াশুনো করেছে। এই পরিবেশ ও শুচিতা নষ্ট করার অধিকার কারোরই নেই। যাঁদেরই রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটুও শ্রদ্ধা আছে তাঁদেরই উচিত এই ভ্রষ্টতার প্রতিবাদ করা।

—আমরা ঘরে বসে হুইস্কি খেলেই কি ভ্রষ্টাচার হয়ে যাবে?

—না, তা হবে না। তবে ঘরের বাইরে গিয়ে যদি করি তাহলে ভ্রষ্টাচার হবে বৈকি।

বংশী ঘর থেকে চলে গেলে কুমুদিনী বলল, ডাহুকদা!

কুমুদিনী তার সোফা ছেড়ে ডাহুকের সোফার হাতলে এসে বসে গভীর প্রেমময় স্বরে বলল, প্রথম দেখার দিন থেকে আপনি আমাকে এমন ভালবাসলেন কেন বলবেন কি আমায়?

—সব প্রশ্নর উত্তর মুখে দিতে নেই।

—তবে, উত্তর কি জানাই যায় না সেইসব প্রশ্নর?

—জানা যাবে না কেন? অবশ্যই যাবে। সেই সব প্রশ্নর উত্তর চোখের ভাষাতে পড়ে নিতে হবে, অন্যজনের আচরণের কোমলতায় অথবা উষ্ণতায় চিনে নিতে হবে। সব কথা মুখে নাই বা বলা হল!

—আমাকে ভালবাসার কারণটা তো বলবেন। আমার এই বত্রিশ বছর বয়সে আমার গার্হস্থ্য জীবনকে টোর্নাডোর মতো তছনছ করে যে দিলেন তার কারণ তো বলবেন।

—সকলেই টোর্নাডোর বিধ্বংসী রূপটিকেই দেখতে পায়—টোর্নাডো যা ধ্বংস করে তাই-ই দেখতে পায় শুধু, সেই ঝড় যে

মাটিতে বা সমুদ্র আছড়ে পড়ে নিজেকেও যে চূর্ণবিচূর্ণ করে, নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলে, এই সরল সত্যটি কেউই বোঝে না। তুমি তোমার দিক দিয়ে এই মানসিক টৌর্নাডোকে বিচার করেছ কিন্তু আমার দিক দিয়ে বিচার হয়ত করোনি। করলে, আমার কষ্টটাও হয়ত বুঝতে পারতে। যে অন্যকে ভাঙে সে একই নিয়মে নিজেকেও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। তার ক্ষতিটা থাকে তার স্মৃতিতে, তার অন্তর্মহলে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তোর বহিরঙ্গে সেই ঝড়ের কোনও চিহ্ন পড়ে না।

—আমার মধ্যে কী এমন দেখেছিলেন আপনি? কত পাঠিকা, বা শ্রোতা, বা ছবির অনুরাগীই তো আছে আপনার। তা ছাড়া, আমি তো আপনার একমাত্র প্রেমিকা নই। সে কথা আমি যেন জানি, আপনিও ভাল করেই জানেন।

—হ্যাঁ। সে কথা অস্বীকার করব না। করার কোনো প্রয়োজনও নেই। কিন্তু প্রত্যেক মেয়েই আলাদা আলাদা। ভাগ্যিস। নইলে পৃথিবীটা যে কী আনইন্টারেস্টিং হত।

—শুধু মেয়েই কেন? প্রত্যেক পুরুষও।

—শুধু পুরুষই বা কেন, প্রত্যেক কুকুরও। কুকুরদের চোখে চাইলেই বুঝবে, তারা তাদের মেজাজে, বুদ্ধিতে কত আলাদা। ওই স্বাতন্ত্র্যই তো মানুষ আর জীবজগতের প্রত্যেকের বেঁচে থাকার চাবিকাঠি। তাছাড়া, সৌন্দর্য বিধাতার এক আশ্চর্য দান। সৌন্দর্য মানে, গায়ের রং, চোখ নাক, চিবুকের বৈশিষ্ট নয়, সৌন্দর্য মানে বুদ্ধি। এই বুদ্ধিই তো মানুষ আর কুকুরকেও একে অন্যর থেকে পৃথক করেছে। ভাল করে চেয়ে দেখলে বুঝবে, প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র। আমরা, যারা ছবি আঁকি, এ কথা যতটা জানি অন্যরা হয়তো ততটা জানেন না, মানে, খেয়াল করেন না। প্রতিটি মানুষের মনের ভাব, তার শরীরী ভাষা, তার ঋতিকে আলাদা করে না চিনতে পারলে কী চিত্রী কী ফোটোগ্রাফার কিছুই, হওয়া যায় না। আর এই চেনাচেনি করতে গিয়েই তো বিপদ ঘটে যায়, অন্তত আমার ক্ষেত্রে।

—আপনি অনেক চেয়েছেন আমার কাছে, অনেকদিন ধরে। আমি আজকে উজাড় করে দিতে এসেছি। পরক্ষণেই কুমুদিনী গেয়ে উঠল,

'আমার যা আছে, আমি সকলি দিতে পারিনি তোমারে নাথ'।

—তুমি দিতে অবশ্যই পারো কিন্তু আমি তা নিতে পারি না। পাঁচ-দশ বছর আগে হলেও পারতাম, আজ আর পারি না। আজ তোমাকে আমি তোমার সর্বস্বতাতে গ্রহণ করতে অপারগ। তোমাকে ঠকাতে পারব না। তোমাকে ভালবেসেছি বলেই।

—ঠকানোর কথা কেন আসছে? আমি যে ধন্য হব। আমার কি ধন্য হবার অধিকারও নেই?

—অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার পক্ষে আমার সর্বাঙ্গে তোমাকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা নেই। হয়তো ক্ষমতাও নেই। না, আর নেই।

—বড় হেঁয়ালির মতো কথা বলেন আপনি।

—জাবনটাই এক হেঁয়ালি, নানা রহস্যে মোড়া। জীবন তো অঙ্ক নয় কুমুদিনী। আর অঙ্ক নয় বলেই তো জীবন এত সুন্দর।

—আমাকে আপনি চাননি? এখন কী বলতে চান? আমার প্রতি শারীরিক কোনও আকর্ষণ বোধ করেননি কোনোদিন?

—প্রথম দিন থেকেই তোমার প্রতি এক দুর্নিবার শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেছিলাম। সে কথা তুমিও বুঝতে পেরেছিলে। এবং পেরেছিলে বলেই বাঘিনী যেমন তার মৃত শিকারকে নিয়ে গেলে, তাকে উল্টোয়, পাল্টায় তুমি তেমনি করেই হার-মানা আমাকে তাচ্ছিল্যর সঙ্গে উল্টে-পাল্টে খেলেছিলে। আজ প্রায় সাত-আট বছর হয়ে গেল। যাঁরা প্লেটোনিক প্রেমের কথা বলেন, তাঁরা জানেনই না যে তাঁদের মনের গভীরেও এক সুপ্ত যৌন-বাসনা কাজ করে। তুমি লক্ষ্য করে দেখলে দেখবে যে, যারাই ভালবেসে বিয়ে করে তাদের দুজনের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মিক মিল বা রুচির মিল যতটা তার চেয়ে শারীরিক গড়নের মিল অনেকই বেশি। এটা ঘটে নিবিড় যৌন-আকর্ষণেরই জন্যে। তা চেতনে না থাকলেও, অবচেতনে অবশ্যই থাকে।

কুমুদিনী অত্যন্ত আহত ও অপমানিত হয়ে বলল, তা হলে আপনি এতদ্দিন আমার সঙ্গে এমন করে খেললেন কেন?

—এটা খেলা নয় কুমুদিনী। এই খেলাতে তুমি যেমন আমাকে

অনেকবার রূঢ় আঘাত দিয়েছে। এই অচেনা আমিও তোমার দেওয়া আঘাতে আঘাতে জ্বর জ্বর হয়ে আমাকে চেনার দিকে এগিয়েছি। ধীরে ধীরে। "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।" রবীন্দ্রনাথ 'তোমায়' বলতে প্রেমিকাকে বোঝাননি, ঈশ্বরকেই বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তো প্রেমিকা বা প্রেমিকেরই আরেক রূপ।

—সেটা ঠিক। আমি কি নিরাবরণ হয়ে দাঁড়াব আপনার সামনে। যা-কিছু দেখার জন্যে এত দীর্ঘদিন আমার কাছে কাঙালের মতো প্রার্থনা করেছেন তার সবই দেখুন আজ দু চোখ ভরে। যা দেখা যায় না নগ্ন চোখে তা তো আপনাকে আপনার অজানিতেই অনুক্ষণ দিয়েছি, যা দেখা যায়, তা আজকে গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি কি আমার ন্যুড স্টাডি করবেন? করলে, করুন, আমার আপত্তি নেই।

ডাহুক মিটি মিটি হাসছিল।

বলল, না আজ নয়।

—কেন নয়? নয় কেন?

—খিদের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর প্লেটভর্তি খাবার সাজিয়ে আনলেও তখন ইচ্ছে করে না, পিত্তি পড়ে যায়। সংসারে সব জিনিসেরই একটি সময় থাকে। দেওয়ার সময়, নেওয়ার সময়, সেই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়ার খেলা খেলতে না যাওয়াই ভাল। হবে, অন্য কোনোদিন। হাতে থাক কিছু। বাকি কিছু থাক।

বলেই বলল, তুমি ডম মরেস-এর লেখা পড়েছ? গান শুনেছ সুজান ভেগার?

—না। ডম মরেসই বা কে? আর সুজান ভেগা?

—ডম মরেস মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক মরেসের ছেলে। ফ্যাঙ্ক মরেস অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের রিপ্রেজেন্ট করতেন ভারতের পার্লামেন্ট-এ। এম পি ছিলেন। ডম তাঁরই ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই গদ্য ও পদ্যও লেখালেখি করতেন। ওঁর একটিই গদ্যগ্রন্থ পড়েছিলাম আমি, 'মাই গড ডায়েড ইয়াং'। অতি

অল্প বয়সে লেখা। তখন 'ইমপ্রিন্ট' নামের একটি মাসিক ইংরেজি কাগজ বেরোত। সম্ভবত বোম্বে থেকে, ঠিক মনে নেই। সাহিত্যের কাগজ। অনেক ভাল ভাল লেখা বোরোত তাতে। সেখানে ডম-এর একটি কবিতা পড়েছিলাম। তখন আমি কলেজের ছাত্র। গা শিরশির করে উঠেছিল।

—কী কবিতা?

—পুরো তো মনে নেই। দুটি লাইন মনে আছে। তবে আগে পরের লাইন।

—বলুন।

—'শো মি দ্যা হাইবিসকাস ফ্লাওয়ার বীটউইন ইওর থাইজ'। লাইনটি পড়ে পল গঁগা বা ভ্যান ঘগ এর ছবি ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে। আর একটি লাইন ছিল ''দ্যা জুস বিটউইন দ্যা থাইজ'। অনভিজ্ঞ অল্পবয়সীর মনে সেই লাইন দুটি আলোড়ন তুলেছিল।

—হাইবিসকাস কি ফুল?

—তাও জানো না? জবা। মরেস সম্ভবত রক্তজবাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। পরিণত বয়সে পৌঁছে বছর পনেরো কুড়ি আগে এরিকা ইয়াং-এর একটি বই পড়েছিলাম, 'সেভ ইওর ওওন লাইফ।' খুব মজার বই। দেখব। যদি খুঁজে পাই। কলকাতার বাড়িতে আমার বইপত্রর যা অবস্থা। জগাই তো আমার লাইব্রেরিয়ান।

—কে?

—তুমি তো কখনও যাওনি আমার কলকাতার বাড়িতে। এখানের স্যাম্পল তো দেখলে মিস্টার বংশীবদন অ্যান্ড ভাগ্নে মদন। কলকাতায় গেলে শ্রীমান জগদীশচন্দ্র পাড়ুইকে দেখবে।

—আর সুজান ভেগার কথা বললেন না?

—হ্যাঁ বলছি। তিনি এক ইংরেজ তরুণী। সত্তরের দশকে তাঁর অ্যালবাম আলোড়ন তুলেছিল। জিনের লেখা কবিতা নিজেই সুর দিয়ে গাইতেন।

—মনে আছে কিছু গান?

—ঠিক মনে নেই তবে আমার ডায়েরিতে লেখা আছে।

—একটাও মনে নেই?

—দেখি, চেষ্টা করে। মনে থাকলে, গেয়ে শোনাচ্ছি। সেই তরুণীর গলার স্বর ছিল সামুদ্রিক ছোট পাখির মতো। সমুদ্রে ফেনা যেমন বিড় বিড় করে তটের ভেজা বালিতে মরে যায়, তেমনি করে স্যান্ডপাইপার বা স্নাইপ বা স্নিপেটের স্বরেরই মতো সেই স্বর মরে যায়, সামুদ্রিক হাওয়াতে উড়ে যায়।

—শোনান না একটা ডাহুকদা।

"আই ওন্ট ইউজ ওয়ার্ডস এগেইন
দে ডোন্ট মীন হোয়াট আই মেন্ট
দে ডোন্ট সে হোয়াট আই সেইড
দে আর জাস্ট ক্রাস্ট অফ দ্য মীনিং
উইথ রেল্মস আন্ডারনিথ

নেভার টাচড
নেভার টাচড
নেভার ইভিন মুভড দো

ইফ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়্যার লিকুইড

অ্যান্ড ইটস্ গান
গান
অ্যান্ড গান, ইটস গান।

তারপর ডাহুক বলল, আমি জাপানের একাধিক ছোট ছোট আশ্রমে গিয়ে তিনচারদিন করে থেকেছি। এক্কেবারে ছোট্ট আশ্রম। সকলে কিমোনো পরে থাকেন, টাটামি ফ্লোরের ওপরে গদিপাতা বিছানাতে শোন, আশ্রমের মধ্যে খালি পায়ে থাকেন, একসঙ্গে অতি সাধারণ খাওয়া দাওয়া করেন, মন্ত্রোচ্চারণ করেন। জাপানিরা যে কীরকম সৌন্দর্য-মনস্ক জাতি তা ঐ সব আশ্রমে গিয়ে থাকলে এখনও বোঝা যায়। সেই জাপানের সঙ্গে টোকিও, কোবে, নাগাসাকি ইত্যাদি বড় শহরের জিনস আর টপস পরা মেয়েদের আর স্যুট পরা আমেরিকানাইজড পুরুষদের

কোনও সম্পর্ক নেই। 'বিশ্বায়ন' যে এইসব পূর্ব এশিয়ার পুরনো ও গভীর ঐতিহ্যবাহী দেশগুলোর কী পরিমাণ ক্ষতি করল যেদিন আমরা বুঝতে পারব, সেদিন অনেকই দেরি হয়ে যাবে। এখন আমেরিকানদের প্রভাব এমনই পড়েছে সারা পৃথিবীর ওপরে, ভোগবাদ এমন করে আধিপত্য বিস্তার করছে ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান এমনকী, ভিয়েতনাম এবং মায়ানমারের ওপরেও, ভাবতে পর্যন্ত পারবে না তুমি। এই বিশ্বায়ন যে কোথায় নিয়ে যাবে পৃথিবীকে, তা জানা নেই। অর্থই এখন সারা পৃথিবীতে একমাত্র প্রার্থনার জিনিস, একমাত্র, সাধনার জিনিস।

ডাহুক বুঝতে পারল যে তার 'বক্তৃতা'টি কিঞ্চিৎ দীর্ঘই হয়ে গেল। যখন সে বক্তৃতা শেষ করে তাকাল কুমুদিনীর দিকে, দেখল তার গ্লাসের পাতিয়ালা পেগটিও প্রায় এক চুমুকে শেষ করে সে তার সোফাতে একেবারে এলিয়ে পড়েছে।

ডাহুক অল্পক্ষণ চিন্তিত মুখে চেয়ে রইল কুমুদিনীর সুন্দর, নিষ্পাপ এবং অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মুখে। তার নাম কুমুদিনীই হওয়া উচিত ছিল। অন্য নামে ওকে মানায় না।

ঘন্টার রিমোট সুইচটা টিপে বংশীকে ডাকল ডাহুক একবার।

বংশী এলে ডাহুক বলল, বোতলটা শেষ হয়ে গেছে। আমাকে আর একটা বোতল এনে দাও, আর একটু বরফ। এ-বোতলটা নিয়ে যাও। তারপর বলল, মনে হচ্ছে মেমসাহেব আজ আর বাড়ি যেতে পারবেন না। আমার কাছেই থাকবেন।

—এঁজ্ঞে?

অবিশ্বাসের গলাতে বলল বংশী।

হ্যাঁ। তুমি রিকশাঅলাকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে দাও আর বলে দাও কাল সকাল দশটা নাগাদ এসে নিয়ে যাবে মেমসাহেবকে তাঁর বাড়ি। ওঁর বাড়িতে একটা খবর দিয়ে দেবে। আমার ফোন নাম্বারটাও লিখে দিও। আর দেখো তো টেলিফোনের বইতে সম্রাট রায়-এর নামে কোনও ফোন নাম্বার পাও কি না। অবশ্য ফোনটা ওর বাবার মৃত্যুর পরে মায়ের নামেই থাকার কথা কিন্তু তাঁর নাম তো আমি জানি না। মেমসাহেবের নাম্বার

জানি কিন্তু সে মোবাইল তো মেমসাহেবের পকেটে। তাতে ফোন করে তা লাভ নেই কোনো! সম্ভবত বন্ধ করাও আছে। নইলে এতক্ষণে একটাও ফোন এলো না এটা আশ্চর্যের।

—যা যা বললেন করছি। কিন্তু মেমসাহেব কি কিছু খেতে পারবেন?

—মনে হয় না।

—আপনি?

—আমি, যা বেঁধেছো তাই খাব। স্যুপ করেছ তো?

—হ্যাঁ।

—কী স্যুপ?

—চিকেন স্যুপ।

—টোম্যাটো স্যুপ করলেই পারতে। স্যুপটা কী করবে তা আগে একটু জিগগেস করে নেবে।

বংশী যেন কী বলবে বলবে মনে হল ডাহুককে।

—কিছু বলবে? কী বলবে, বলো।

—বড় পিসিমা জানতে পেলে কুরুক্ষেত্র বাধাবেন।

—কার বড় পিসীমা?

—এঁজ্ঞে আপনার।

কীসের জন্যে?

—মেমসাহেবকে নিয়ে রাত কাটাবেন....

—উনি বিলিতি মেমসাহেব নন, দিশি মেমসাহেব। তাছাড়া একেবারে চলচ্ছক্তিহীন বলেই আমার ঘরেই রাত কাটাতে হবে। আমার বিছানাটা সোফা-কাম-বেডএই করো। উনি খাটেই শোবেন। আমার বিছানাতে।

—বমি টমি করে দেবেন না তো ? নতুন বেডশিটটা পেতেছি।

না, সে সব নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না।

—উনি ত প্রায় অজ্ঞানই হয়ে গেছেন। শোবার ঘরে যাবেন কী করে?

—তুমি কোলে করে নিয়ে যাবে।

জিভ কেটে বংশী বলল, আমি পারব না বাবু।

—তুমি না পারলে অগত্যা আমাকেই নিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু বড় পিসিমা?

—বড় পিসিমা জানবেন কী করে?

—উনি আমাকে জিগগেস করলে আমি মিথ্যা বলতে পারব না।

—কী জিজ্ঞেস করবেন? উনি মেমসাহেবের কথা জানবেন বা কী করে?

—না এঁজ্ঞে। এতবড় অধম্ম।

—তার মানে, তুমিই বলে দেবে পিসিমাকে। তা বলতে পারো। তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না। তবে তোমার চাকরিটি যাবে। তোমার ভাগ্নে মদন, তোমার প্রিয় ন্যাওটা, তোমার কোলা ব্যাঙ, কুটরে ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ সব নিয়ে এখান থেকে যেতে হবে। বাগানের কাজ তো কিছুই জানো না, গুণের মধ্যে রান্না আর মোসাহেবিটা ভালই পারো। বাগান তো সামলায় রাধুমালী। আর বাগানই তো আমার প্রাণ। তুমি ভাল চুকলিও করতে পারো।

তারপর বলল, সত্যি বংশী। মাঝে মাঝে আমার বুঝতে অসুবিধে হয় তুমি পুরুষ না মেয়ে।

—এত চিন্তারই কী আছে বাবু। একদিন বললেই তো দেখিয়ে দিতে পারি।

—নাঃ, তুমি একটি রিয়্যাল ইনকরিজিবল।

বংশী ভীষণই চিন্তান্বিত হয়ে চলে গেল, যেন ডাহুকের চরিত্রনাশ হলে তারই সর্বনাশ।

ডাহুক ভাবছিল সত্যি। বড় পিসিমাও যে আর কতদিন বাঁচবেন। জ্যোতিবাবুরই সমবয়সী কিন্তু ফ্যাকাল্টিজ সব ইনট্যাক্ট। রিফ্লেক্সও সমান সজাগ। বড়পিসিমা ডাহুকের সম্পদ না বিপদ তা সে কোনওদিনই বুঝে উঠতে পারেনি। পিসিমার শাসন তার উপরে এমনই কঠোর যেন সে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। ভাগ্যে তিনি তাঁর হাটখোলার প্যালেসে থাকেন। আজকাল নিচেও নামতে পারেন না আর্থারাইটিসের জন্যে এবং

গাড়িতেও উঠতে পারেন না—তাই চলাচল নেই। থাকলে কী হয়, টেলিফোনে ডাহুকের মুণ্ডপাত করেন সকাল-সন্ধে—একটা ল্যান্ডলাইন আর দুটি মোবাইল সব সময়েই হাতের কাছেই থাকে।

শাসন যদিও করেন কিন্তু তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী এই হতচ্ছাড়া ভাইপোটিকে স্নেহও করেন খুব। অনেকবার ভয় দেখিয়েছিলেন যে বিয়ে না করলে তাঁকে সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। ডাহুক সেই ভয়ে ভীত না হয়ে বলেছিল, তোমার টাকা তুমি ভারত সেবাশ্রমে দিয়ে দাও—যাঁরা নীরবে এবং প্রচারহীনভাবে সত্যিকারের জনসেবা করেন। ওঁদের ওখানে বড়লোকদের রমরমা নেই সেখানে বড়লোকেরাই ছড়ি ঘুরোন না। তা যদি না দিতে চাও, মানুষের প্রতি যদি তোমার বিরক্তি থাকে, তা হলে তুমি তোমার কুকুর বেড়ালদের জন্যে একটা ট্রাস্ট করে দাও। তারাই পাবে তোমার সব সম্পত্তি।

বড় পিসিমা জানেন যে তাঁর এই ভাইপো কারো ধনের প্রত্যাশা করে না—সে নিজেই যথেষ্ট সচ্ছল এবং তার আঁকা ছবির দাম যেমন দিনে দিনে আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে, তার সচ্ছলতা দিনে দিনে বাড়বেই। তবুও তাঁর যে সব আত্মীয় তাঁর সম্পত্তির জন্যে কাঙালপনা করেন তাঁদের কারোকেই তিনি কিছুই দেবেন না বলে বহুদিন আগেই মনস্থ করেছেন। সব কিছু এই ছোঁড়াকেই লিখে দিয়েছেন উইল-এ। ডাহুক তা না জানলেও।

এদিকে কুমুদিনী কুমুদিনীরই মতো ফুটে রয়েছে ডার্ক মেরুন ফোম লেদারের চওড়া নরম সোফাতে। হলুদরঙা একটি ঘাগরার উপরে তার হলুদরঙা টপস পেটের কাছে একটুখানি উঠে গেছে। চাঁপা ফুলের মতো তার গায়ের রঙের হলুদ আভা ফুটে বেরুচ্ছে। সে দিকে তাকিয়েই হঠাৎ ডাহুক কামমোহিত হল। ওকে প্রথম দিন দেখার পর থেকেই এক তীব্র শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেছিল ডাহুক। খুবই তীব্র। এই বাদল রাতে এলোঝোলো হয়ে যাওয়া এলোমেলো কুমুদিনীকে কাছে পেয়ে তার কাম অত্যন্তই তীব্রতা পেয়েছে। জানে না, কী করবে ও। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিরোধীপক্ষের একজন অত্যন্ত উত্তেজিত এবং উদ্বেলিত এম পিকে উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, 'দ্যা অনারেবল মেম্বার

শুড নট ইনডালজ ইন মোর ইনডিগনেশন দ্যান হি ক্যান কনটেইন।' ডাহুকেরও মনে হচ্ছে এই বয়সে যতখানি কাম সে বইতে পারে, সইতে পারে, তার চেয়েও বেশি কমোদ্দীপনা সে বোধ করছে। এ এক গভীর উদ্বেগের ব্যাপারে। বংশী দরজা টুকটুক করল।

—এসো। কী ব্যাপার?

—বিছানা করে দিয়েছি। সোফা-কাম-বেডও। আপনার খাবার কি লাগিয়ে দেব?

—না। আগে মেমসাহেবকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে যাই।

—বেশ। যা বলবেন।

ডাহুক উঠে কুমুদিনীকে কাঁধে করে বেডরুমে নিয়ে গিয়ে ওর বিছানাতে শুইয়ে দিল। তার কোলবালিশটা কুমুদিনীর দু উরুর মাঝে দিয়ে দিল। কুমুদিনী অস্ফুটে কিছু বলল। বোঝা গেল না। কী বলল।

বংশী বিস্ফারিত চোখে বলল, বাবু আপনার খাবার কি বেডরুমেই এনে দেব ট্রলি করে?

ডাহুক বলল, আগে ট্রলিতে করে হুইস্কি, গ্লাস আর বরফ নিয়ে এসো। আরও দুটো হুইস্কি খাব। তারপর খাবার এনো। তোমাদের কি দেরি হয়ে যাবে?

—না বাবু। আপনি বছরে কদিন আসেন? আমরা তো সারা বছর আপনি আসবেন সেই আশাতেই বসে থাকি। এলে তো আমাদের আনন্দই হয়। মাসে-দুমাসে এক-দুদিন রাত হলে কী হবে?

—না। তোমরা রাত না করলেই হয়। আর তোমরা খেয়ে নাও। আমার খাওয়ার জন্যে বসে থেকো না।

—মেমসাহেবের মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে যদি খিদে পায়? কিছু খাবার কি রেখে দেব ঘরের মিনি ফ্রিজে?

—সেটা মন্দ বলোনি। কিন্তু কী রাখবে? কী আছে তোমার?

—চিকেন স্যান্ডউইচ, মাশরুম আর হ্যাম স্যান্ডউইচ, চিকেন সসেজ। ইটালিয়ান মাস্টার্ড।

—ইটালিয়ান মাস্টার্ড আনছ কেন? ঝাঁঝ নেই। আমাদের কালো সর্ষের কাসুন্দি আনাবে এবার থেকে।

—এঁজ্ঞে বাবু।

—ফ্লাস্কে করে স্যুপও রাখতে পারি। আর কোল্ড ড্রিঙ্ক কি কিছু রাখব?

—না, কোল্ড ড্রিঙ্ক রাখতে হবে না। রেড ওয়াইন আছে কোনও?

—আছে। গতবার আপনি দু বোতল নিয়ে এসেছিলেন। খরচ হয়নি। ফ্রিজে কি রেখে দেব?

—কিছুই শেখোনি এতদিনেও। রেড ওয়াইন রুম টেম্পারেচারে খেতে হয়। হোয়াইট ওয়াইন ফ্রিজে রাখতে হয়। রেডওয়াইনের সঙ্গে দুটো ওয়াইন-গ্লাসও রেখে দিও মিনি ফ্রিজ-এর উপরে। ফ্রিজে জলের বোতল আছে তো? কী ওয়াইন? জানো কি? জুবিলি স্টোর্স কী দিয়েছিল, কে জানে।

—আছে বাবু। আপনি বলেছিলেন বর্ষাকালে মিনারাল ওয়াটার রাখতে। তাই মিনারেল ওয়াটারও রেখেছি। আর ওয়াইনের নাম তো বলতে পারব না। তবে ফ্রান্স না কী যেন লেখা আছে বোতলের গায়ে।

—ভালো করেছ। এখন হুইস্কি, বরফ আর গ্লাসটা আমাকে দিয়ে যাও।

—এঁজ্ঞে বাবু।

তার পরই বংশী বলল, বড় পিসিমা ফোন করেছিলেন।

—কেন? হঠাৎ বড় পিসিমা? আমি তো তাঁকে বলিনি যে আমি আসব শান্তিনিকেতনে। নিশ্চয়ই কলকাতার বাড়িতে ফোন করে জেনেছেন। কলকাতায় জগার বড়ই বাড় বেড়েছে। ওকে বড় পিসিমা মাঝে মাঝেই টাকা দেন। ও ব্যাটা গুপ্তচর হয়েছে। আমার উপর স্পাইং করে। ও নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে বড় পিসিমাকে। আমি কোথায় যাই না যাই তা তো বড়পিসিমার জানবার কথা নয়। এবারে কলকাতাতে ফিরেই জগদীশকে ছাড়াব। দেশে পাঁচবিঘা ধানজমি, একজোড়া বলদ সব কিনে

দিলাম। অথচ এমন নিমকহারাম!

—বাবু, আমার জোড়া বলদ চাই না, একটা গরু যদি কিনে দেন তা হলে আমার নক্কী দুধ বেচে দুটো পয়সা কামাতে পারে।

—কেন? তোমাকে কি কম মাইনে দিই অমি? তোমার বউ-এর তো পায়ের উপর পা তুলে দিন কাটাবার কথা। তুমি কি বউ টাকা পাঠাও না? পাঠালে, সে টাকা থেকে গরু কিনতে অসুবিধে কী ছিল? ফুলডাঙাতে কি রাখনি রেখেছো? বংশীবদন? সব টাকা কি সেখানেই ঢালছ?

বংশী কানে হাত দিয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ বাবু। কী যে বলেন। অমন পাপের কতা মুখেও আনবেন না।

—যাও। রাত বাড়ছে। আর কথা না বাড়িয়ে বসবার ঘর থেকে হুইস্কিটা নিয়ে এসো।

—ঠিক আছে।

—বংশী হুইস্কির বোতল বরফ আর গ্লাস বসবার ঘর থেকে নিয়ে এল ট্রলি করে।

—কতক্ষণ পর খাবার আনব বাবু?

—এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে।

বংশী চলে গেলে ঘরের বড় আলো নিবিয়ে বেড লাইট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল ডাহুক। আলোর বৃত্তটা কুমুদিনীর মুখের উপরে পড়েছে। ওর ফর্সা রঙে যেন যেন এক দীপ্তি লেগেছে। গালে একটি বড় কালো তিল—তাতে ওর সৌন্দর্য বেড়ে, গেছে অনেক। তবে চুলটা ছেলেদের মতো করে কাটাতে ওর বিলক্ষণ সৌন্দর্যহানি হয়েছে। চুল যে মেয়েদের কতবড় সৌন্দর্য তা শুধু পুরুষেরাই জানে। এবং মেয়েদের লম্বা চুলে যে যৌনতা মাথা থাকে তাও পুরুষমাত্রই জানে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কথা মেয়েরা নিজেরা জানল না। আধুনিকতার ছুতোতে তারা তাদের ব্রহ্মাস্ত্রগুলোকে নিজ হাতে ভোঁতা করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

কুমদিনীর মাথার চুলের দিকে চেয়ে সেই উজ্জ্বল কালো রঙে চোখ বেঁধে গেল ডাহুকের। ও কল্পনা করার চেষ্টা করছিল কুমুদিনীর উরুসন্ধির

কোমল চুলের রঙের কথা। সাধারণত মেয়েদের মাথায় চুলেরই মতো রঙের হয় উরুসন্ধির চুল। ব্যতিক্রম হয়ত থাকে। তবে ডাহুক তেমন কখনও দেখেনি।

বিছানা থেকে সরে এল—স্লিপিং বিউটিকে শায়ীন এবং প্রায় অচৈতন্য অবস্থাতে দেখে তার মন ভরে গেল। ঘাঘরাটি হাঁটুর নিচ অবধি উঠে গেছে। কী যে সুন্দর দুটি পা। সমারসেট মম-এর কেকস অ্যান্ড এলর্স' উপন্যাসে একটি পংক্তি ছিল 'ড্য ওলওয়েজ ওয়্যার আর পেয়ার অফ বিউটিফুল লেগস'—পংক্তিটির কথা মনে পড়ে গেল।

আজ তার অনেকদিনের স্বপ্ন পায়ে হেঁটে শান্তিনিকেতনের লাল কাঁকর আর মোরাম পেরিয়ে তার এই বনবাসে এসেছে। স্বপ্ন দূর থেকেই ভাল। সব সময়ই। ত্বকের ছোঁয়ার স্বপ্ন মরে যায়।

কুমুদিনী ওকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে বলেছিল ডাহুককে। তার আসল নাম এখানে উচ্চারণ পর্যন্ত করা যাবে না। ঐ উপন্যাস কুমুদিনীকেই উৎসর্গ করবে ডাহুক কিংবা 'কুমুদিনীদের', যাতে পাঠকের স্পটলাইট ওর একার মুখে না থেকে, সরে যায়। ঘাই হরিণী আর হরিণীর দলের চোখে রাতের বেলা আলো পড়লে একার চোখ জ্বলে তারার মতো আর হরিণীদের চোখ জ্বলে জোনাকির ঝাঁকের মতো।

হুইস্কি খেতে খেতে কুমুদিনীর মুখের দিকে চেয়ে ও অস্ফুট আবৃত্তি করল, 'She! She! like a visiting sea which no door could ever restrain.'

কুমুদিনী শুয়ে আছে এক Slab হলুদ আইসক্রিমের মতো। তাকে চেটে চেটে খাবার খুব ইচ্ছে করেছে। কিন্তু অভিজ্ঞ ডাহুক জানে যে সত্যি সত্যি চেটে খাওয়ার আনন্দর চেয়ে চেটে খাওয়ার, ভাবনাটা অনেকই বেশি উত্তেজনাকর।

রিমোট বেলটা বাজাল। বংশীবদল এল। সঙ্গে ভাগ্নে মদন, অন্য একটি ট্রলিতে খাবার সাজিয়ে নিয়ে।

ডাহুক বলল, আমি কি তোমার জামাই? না আজ জামাইষষ্ঠী। এত

সব কি? বলেছিলাম তো শুধু খিচুড়ি আর কষা মাংস করতে।

—এঁজ্ঞে বাবু। তাই বলেছিলেন। কিন্তু কতদিন পরে পরে এলেন।

সামান্য খাবার প্লেটে তুলে নিয়ে ডাহুক বলল, সব নিয়ে যাও। ফ্রিজে রাখবে না। তোমরা সব খেয়ে নাও।

—স—ব?

বংশী বলল।

—হ্যাঁ সব।

বংশীর মুখ দেখে মনে হল, ও নিজে যা যা খেতে ভালবাসে সেই সবই রান্না করেছে আজ এবং সে কারণেই ডাহুকের নির্দেশে খুবই খুশি হল।

ডাহুকের খাওয়া হলে আবার রিমোট বেল বাজাল। বংশীবদন এবং ভাগ্নে মদন ট্রলিগুলো সব নিতে এল। এসে উত্তেজিত গলায় বংশী বলল, বাবু, দুটো সব্বোনাশ হয়ে গেল।

—কী হল?

কিঞ্চিৎ "হাই" অবস্থাতে এবং কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে ডাহুক বলল, আবার কী হল?

—পরথম তো মেমসাহেবের বাড়ি থেইকি একজন লোক এয়েচিলেন। তিনি শুধিয়ে গেলেন মেমসাহেব এ বাড়িতেই রাত কাটচ্ছেন কী না! তাপ্পর আপনার নাম-ঠিকানা চাইলেন। আমি আপনার একটা কার্ড দে দিলাম।

—বেশ করেছ।

—কী রকম লোক?

—না, না বাবুক্লাসের নয়, আমাদেরই মতো লোক। সম্ভবত বাড়িতে কাজ করে। তা আমি বইলে দিনু যে আমার বাবুকে চেনে না ভূ-ভারতে এমন কে আছে?

—একেবারে ভূ-ভারতে করে দিলে, শুধু বঙ্গভূম হলে না হয় কথা ছিল।

—হ্যাঁ। যা সত্যি তাই বলে দিনু।

—তারপর?

—তাতে লোকটার তেমন পেত্যয় হলো বলে মনে হলোনি। ভয় হচ্ছে, রাতে পুলুশ-টুলুশ সঙ্গে নে চলে না আসে। এলে, কী করব বাবু?

—তোমার ন্যাওটাকে লেলিয়ে দিও। আর কী করবে? আমার ঘরের দিকে, কারোকে আসতেও দিও না এবং তোমরাও কেউ এসো না। জানো তো আমার সঙ্গে রিভলবার থাকে।

—রিভলবার কী বাবু? ওয়ানশটার?

—না, সিক্স শটার। বিলেতে তৈরি। ওয়েবলি অ্যান্ড স্কটের।

ডাহুক বলল, আর দ্বিতীয় বিপদ?

—সেটি ঘরেলু বিপদ।

—সেটা আবার কী?

—সেই ব্যাঙগুলো যে নিয়ে এল না ওরা?

—হ্যাঁ। নিয়ে তো এল কিন্তু এমন বর্ষার রাত, সেই কুলাঙ্গার ব্যাঙগুলো একবারও ডাকছে না কেন?

—ডাকছে ডাকছে বাবু। কুটুরে ব্যাঙগুলো, যেগুলো গাছে থাকে তারা ডাকছে কুটুর কুটুর করে। কিন্তু কোলা ব্যাঙ আর সোনা ব্যাঙেরা ডাকছে না।

—না ডাকলে ওদের শামবাটির রাস্তাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো। নইলে, রিকশা করে নিয়ে গিয়ে ফুলডাঙাতে নয়ত পিয়ারলেস-এর নতুন হওয়া সেক্টর টু-এর বাড়িগুলোর সামনে ফেলে দিয়ে আসব।

—ঐ ঝিং-চ্যাক বাড়িগুলোর সামনে বাবু? ব্যাঙ? যেখানে স্বপনবাবুরা থাকেন বললেন, ওখানে ব্যাঙগুলো যে না খেয়ি মইরে যাবে বাবু।

—কেন?

—সেখানে যে একটিও পোকা-মাকড় নেই।

ডাহুক স্বগতোক্তি করল, কীড়ে মাকড়ে নেই এমন জায়গা

শান্তিনিকেতনে একটিও নেই। এটাই তোমার দ্বিতীয় বিপদ?

—এঁজ্ঞে না বাবু। দ্বিতীয় বিপদ সেটা নয়।

—তবে সেটা কী?

—সোন্দর সোনা ব্যাঙটাকে ঢ্যামনা সাপটা ধইয়েছে—ধইরে, আইসতে আইসতে গিলতিছে। আর সি ব্যাজটা আইরতনাদ কইরতিছে।

—কোথায়?

—বাঁশঝাঁড়গুলোর নিচে। সেই যে ছত্তিশগড়ের জঙ্গল থেকে নে এইছেলেন গদুবাবু।

—তাতে তোমাদের কী হয়েছে? এসব খাদ্য-খাদকের ব্যাপার। তোমরা ইকোলজির কী বোঝো?

বলেই ভাবল, উলুবনে মুক্তো ছড়ানো হলো।

বংশী বলল—বাবু, আমি তালে যাই। রাতে কোনো পেয়োজন হইলে বেল মারবেন। আপনাকে কি আরেকটা কোলবালিশ দেব?

—না।

ডাহুক বলল। কোলবালিশের দরকার হবে না।

তারপর ভাবল, আজই রাতে ঢ্যামনা সাপের নবাগন্তুক সোনা ব্যাঙটাকে আইসতে আইসতে গিলে ফেলটা কি অত্যন্তই সিম্বলিক নয়?

ডাহুক সম্বিৎহীন কুমুদিনীর দুটি প্রস্ফুটিত স্তনপদ্মর দিকে চেয়ে রইল, যে দুটি, স্থলপদ্মর মতো ফুটে ছিল তার ঘরে।,





১২

স্টেশনে পুলিনের আসার কথা গাড়ি নিয়ে। বাড়াতে বাড়াতে হাওড়া স্টেশনের পার্কিং ফি সত্তর টাকাতে তুলেছে পূর্ব রেল। আরও কত বাড়াবে কে জানে। যে কোনোদিন একশো টাকা করে দিতে পারে। তখনও গাড়ির ভিড় একই থাকবে এবং সকলেই অম্লানবদনে সেই গুনাগার দেবে। বিনা প্রতিবাদে মানুষ যখন দিচ্ছে তখন পদে পদে এইসব ফিজ এঁরা বাড়াবেনই বা না কেন? এয়ারপোর্টের এন্ট্রি ফি, হাওড়া স্টেশনের পার্কিং ফি।

টোল ট্যাক্সের তবু মানে আছে। বহু বছর আগে থেকে এই ভাবে রাস্তা এবং ব্রিজ বানালে রাজ্যের অনেকই উন্নতি হতে পারত। উত্তরপ্রদেশে এবং অন্যান্য একাধিক রাজ্যে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে প্রতি পদে পদে টোল দিতে হত দেখেছে ডাহুক। তার ফলে উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটক, তামিলনাড়ু এমনকী ওড়িশাতেও অনেক নতুন নতুন রাস্তা ও ব্রিজ হয়েছে।

এই একটা ব্যাপারে (হয়তো আরও অনেক ব্যাপারেই) অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাছে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ উচিত। গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে

কলকাতা থেকে পুব-পশ্চিম এবং উত্তরে যাবার রাস্তার এমনই উন্নতি হয়েছে যে নিজ চোখে না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস হয় না।

সত্যিই হয় না। কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে হাওড়া এই প্রায় আড়াই ঘন্টার পথ পাশে বসা পূর্বপল্লীর শ্যামাবাবু সমস্ত কামরার ইচ্ছুক, অনিচ্ছুক এবং উদাসীন মানুষদের এই সড়ক যোজনা সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে দিতে কানের পোকা বের করে দিলেন। কত রকমের মানুষই না সংসারে থাকে। কেউ পেটে খোঁচা মারলেও কথা কন না আর শ্যামাদার মতো কেউ কেউ নিজেদের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বকর বকর করে নিজের পয়সাতে ঝাল-মুড়ি এবং লেবু-চা খাইয়ে যতক্ষণ না ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকছে ততক্ষণ একনাগাড়ে চালিয়ে যাবেন। তদুপরি মোবাইল ফোনওয়ালাদের অসভ্যতা আছেই। ভাবখানা এমন যেন পুরো কামরাটিই তাঁদের সংরক্ষিত অথবা অফিস কিংবা ঘর এবং প্রত্যেক অন্য যাত্রী যেন তাঁর বা তাঁদের কথা শোনার জন্যে উৎসুক হয়ে আছেন। কামরার মধ্যে মোবাইল-এর ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। প্লেন-এ যেমন করা হয়েছে। অন্য যাত্রীদের প্রাইভেসি এবং শান্তির উপরে এই অত্যাচার অসহনীয়—তাও যদি ভদ্রলোকের মতো গলা নামিয়ে কথাবার্তা বলতেন। এঁরা কী এমন ভি.ভি.আই.পি. যে আড়াই ঘন্টা অপেক্ষা করার উপায় নেই তাঁদের।

ট্রেন থেকে নামতেই পেছন থেকে পিনুদা ডাহুকের পাঞ্জাবির আস্তিন টেনে ধরলেন।

—গাড়ি আছে?

ডাহুক শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দা, অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারের আমলা এই ভদ্রলোককে একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

—নেই।

ডাহুক মিথ্যা কথা বলল।

—তা হলে দেখি কাকে ধরা যায়। পুরো কোচের থার্টি পার্সেন্টের গাড়ি আছেই, কাউকে না কাউকে পাবেই।

তার পরই দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, ভায়া, তুমি কবে এসেছিলে? কাল পরশু ছিলে না?

—হ্যাঁও হয়, নাও হয়, এমন ভাবে মাথা নাড়ল ডাহুক।

—তোমাকে তো ডঃ দীপক মুখার্জি আর ব্যারিস্টার অনিন্দ্য মিত্তিরের পার্টিতে দেখলুম না। সমস্ত শান্তিনিকেতনই তো ইনভাইটেড ছিল।

—আমি আমন্ত্রিত ছিলাম না। তা ছাড়া কাজ ছিল। বাড়ি থেকে খুব কমই বেরোই। বর্ষা উপভোগ করতে এসেছিলাম।

—বা, তা হলে তো কাম্পারি অ্যান্ড সোডাও ছিল।

ডাহুক ওঁকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে বলল, তা ছিল।

আহ! আমাকে ডাকলে না?

ডাহুক চুপ করে রইল।

পিনুদা গাড়িঅলা অন্য কারো সন্ধানে পেছোলেন।

ডাহুককে গাড়িতে যেতে দেখে ফেলতে পারেন কিন্তু ফেললে ফেলবেন। যা ইচ্ছা করে না, তা করে না ডাহুক।

এই পিনুদা মানুষটি অদ্ভুত। তবে ওঁর মতো মানুষের সংখ্যাই বাড়ছে ক্রমশ শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ আদৌ কিছু পড়েছেন কি না জানা নেই ডাহুকের। সাহিত্যের সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু শান্তিনিকেতনে 'ঠাকুর' মাত্রকেই এক বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয় বলে নিজের পদবি অ্যাফিডেভিট করে বদলে ঠাকুর হয়ে গেছেন। ফারস্ট নেম-এও একটু ভার আছে। পিঞ্জন রঞ্জন। পিঞ্জন রঞ্জন ঠাকুর। ও নামের মানে জানে না ডাহুক। পিনুদা বলেই সকলে জানে অবশ্য। উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবারের মানুষেরা, অনিন্দ্য মিত্র যেমন, বেনিয়ান পরতেন এবং পরেন তেমন বেনিয়ান পিনুদাও পরেন।

ডাহুকের মনে হয়েছিল, ওঁদের দুজনেরই নেসফিল্ডের গ্রামারটা সম্ভবত খুব পড়া নেই। থাকলে, দুজনেই জানতেন যে THE-র উচ্চারণ ভাওয়েলের আগে 'দি' হয় আর কনসোনেন্ট-এর আগে হলে 'দা' হয়। অথচ দুজনেই অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলেন।

কতরকমের মানুষ নিয়েই এই সংসার। এবং অবশ্যই এই শান্তিনিকেতন। যেন চিড়িয়াখানা। সেই চিড়িয়াদের মধ্যে সে নিজেও পড়ে অবশ্য।

গাড়ির পাশে পুলিন দাঁড়িয়েছিল। ভাবতে ভাবতে ডাহুক গাড়িতে উঠল।

বাড়ি পৌঁছাতেই জগদীশ ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইল-এর কল এর লিস্ট দিল। কাজের ব্যাপারের ফোনগুলো সোমবার করবে ঠিক করল। দুটি ফোন-এর জবাব এখুনি দেওয়া দরকার। একটি বড় পিসিমার ফোন আর দ্বিতীয়টি কুমুদিনীর। জগাকে বলল, বড় পিসিমার লাইনটা দে তো।

বড় পিসিমা লাইনে ডাহুক বলল, হ্যালো।

—কে রে? খোকা?

—হ্যাঁ পিসিমা। কেমন আছ?

—মাঝে মাঝে ফোন করেই কর্তব্য শেষ। একবারও কি এসে চাঁদমুখটি দেখাতে পারো না?

—তুমি যখন বলবে তখনই যাব। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে?

—বাঁদর কোথাকার।

—তোমার ডাক্তার মোক্তার সব ঠিকঠাক সার্ভিস দিচ্ছে তো!

—ঘোড়ার ডিম। পচা ডাক্তারের ভারী পায়া ভারি হয়েছে। গাড়ি কিনেছ তো। তিনবার ফোন করলে একবার আসে।

—আহা পিসি, গাড়ি আজকাল কে না কিনছে? আমাদের এ পাড়ার পানওয়ালাও কিনেছে একটা। কিন্তু তুমি পচা ডাক্তারকে বাড়িতে ডাকলে কত ফিস দাও তাঁকে।

—অনেক টাকা দিই। গত পাঁচ বছর ধরেই তো এই ফিসই দিয়ে আসছি।

—কত বলো না?

—একশ টাকা।

—এই বাজারে সেটা কি একটা ফিস হল পিসি। তার ডাক্তারি পড়ার

সময়ে না হয় সাহ্যয্যই করেছিলে, তা বলে.....

—বেশি কথা কোসনি। ওর তো আমাকে সারা জীবন বিনি পয়সাতেই দেখা উচিত। তেমনই তো বলেছেলো পরীক্ষা পাস করার পর।

—বলেছিলেন। কিন্তু তখন তো বুঝতে পারনেনি যে তুমি চুরানব্বই বছর অবধি ব্যাট করবে।

—খপর্দার বাজে কথা কইবিনি।

—তোমার শরীরে অসুবিধাটা কী?

—অসুবিধে আর কী? খিদে হয় না তেমন, গা ম্যাজ ম্যাজ করে।

—হাঁটতে জোর পাও তো?

—তা পাই। এখনও তো তুলসীতলাতে যাই রাধাগোবিন্দজির মূর্তিতে পুজো দিয়ে। সেদিন মন্দাকিনী একটা ছেঁড়া জুতো ফেলে রেখেছিল বারান্দাতে—এমন এক নাতি কষালাম যে তা উড়ে গিয়ে পড়ল যদুবাবুদের উঠোনে। যদুবাবু গামছা পরে উঠোনে বসে অলিভ অয়েল মেসেজ করাচ্ছিলেন এক ছোঁড়াকে দিয়ে—তা সে চটি গাছা গিয়ে পড়ল তো পড় যদুবাবুর ভুঁড়িতে। কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। তাপ্পর আমিই শুট মেরিচ তা জানতি পেরে উপর পানে দু'হাত জড়ো করে বললেন, বউদিমণি গো! তোমার নাতিমারা চটি আমার পুরস্কার।

বলতে বলতে বড় পিসিমার গলা ভারী হয়ে এল।

ডাহুক বলল, পিসি শব্দটা মেসেজ নয়, মাসাজ। তোমার মতো শিক্ষিত মহিলা হয়ে...

—ঐ হল। মানে বুয়েচিস তা। আজকাল অনেক জানা কথাও গোলমাল হয়ে যায়।

তারপর বললেন, শান্তিনিকেতনে কোন মেয়ে এয়েচেলরে তোর কাছে। তোর সঙ্গে নাকি রাত কাটালে?

—মেয়ে? কোন মেয়ে?

—বংশী বুঝি বলেনি আমাকে ভেবেচিস। খপর্দার বলছি। ন্যাড়া

মিত্তিরের নাতনি রেশমি এখান থেকে, বিলেত থেকে, চার চারটে পাস দিয়েছে। মেমদের মতো ইংরেজি বলে। দেকতে, রানি মুখার্জির মতো। কী সুন্দর হাসিটা ওর—। আর তাকেই তোর মনে ধরচে না। আমার মাথার দিব্যি। এই মলমাসগুলো পেরোলেই চার হাত এক না করতে পারলে আত্মহত্যা করব।

—পিসিমা, অমন অলুক্ষণে কথা বোলো না। নিশ্চয়ই তোমার ডিপ্রেশন হয়েছে। তোমাকে এক কেস ব্ল্যাক ডগ হুইস্কি পাঠিয়ে দেব। অনেকের কাছেই শুনেছি যে, জ্যোতিবাবুও ঐ ব্র্যান্ডই খান। সন্ধেবেলা তোমার আহ্নিক সেরে দুটা পেগ দিয়ে আবার আহ্নিক করো, দেখবে তুমি রানি মুখার্জির মতো হাসছ, গাইছ, নাচছ। আমি পুলিনকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। জগাকেও। কী করে বানাতে হয়, মন্দকিনীকে দেখিয়ে দিয়ে আসবে। একটি পেগ মেজারও দিয়ে আসবেখন। সত্যি বলছি পিসি, এই নির্জৌষধি খেয়ে দেখো, সাত দিনে তুমি যুবতী হয়ে যাবে—পাশের বাড়ির যদুবাবু মধুবাবুবা বারান্দার রেলিং ধরে সারি দাঁড়িয়ে তোমার মনোযোগ পাবার জন্যে কমপিটিশনে নামবেন।

—বাঁদর!

তার পর একটু চুপ করে থেকে বললেন, এই বয়সে পৌঁছে বাঁচার আর কী মানে আছে বল? কোন আনন্দটা আছে? একে বাঁচা বলে না।

—তবে কী বলে?

—এ শুদুমুদু দিন যাপন। প্রশ্বাস নেওয়া আর নিশ্বাস ফেলা। নাঃ। একে বাঁচা বলে না। বাঁচা একটা মস্ত বড় ব্যাপার। বাঁচাটা একটা উৎসব।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বড় পিসি বললেন, ভেবেছিলাম ছোড়দার ছেলেটাকে শিব গড়ব। তুই হলি একটা বাঁদর।

আর একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁরে, তুই নাকি কী সব অসভ্য নেকা লিকছিস আজকাল, যদুবাবুর ছোট বউমা পাখি বলচেল।

—বই তো কতই লিখেছি পিসি। পৃথিবীটাই আর সভ্য নেই, সভ্য লেখা লিখব কী করে! যদুবাবুর ছোট বউমাকে আমার নাম্বারটা দিয়ে

ফোন করে বলতে বোলো তো বইয়ের নামটা। তোমাকে পাঠিয়ে দেব। তুমিই পড়ে দেখো। পড়লে, তুমিও যুবতী হয়ে যাবে। অতই যদি খারাপ লিখি তা হলে যদুবাবুর ছোট বউমা পড়ছে কেন?

—তা আমি কী করে বলব, কেন পড়ে?

তারপর বললেন, চোখটাই শত্রু হয়েছে। টিভিই দেখতে পারি না ঠিক মতো।—তোর মোবাইল নাম্বারটাই কি দেব?

—কাকে?

—আরে পাকিকে?

—না, না, মোবাইল নয়, ল্যান্ডলাইনই দিও।

—হ্যাঁরে, জ্যোতির চুরানব্বই বছরে সম্বর্ধনা দিচ্ছে কারা?

—কে দিচ্ছে?

—আরে কলকাতার মেয়র। টাউন হল-এ। ধম্মতলাতে গোপাল হোর্ডিং দেখে এয়েচে।

—জ্যোতি কে? কোন জ্যোতি? জয়ন্তী ডলোমাইটের মালিক?

—আরে তোদের জ্যোতি বসু। পশ্চিমবঙ্গে কটা জ্যোতি আছে?

—তোমার ইয়ার নাকি? এমন করে বলছ। পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

—আরে আমরা তো একই ইয়ারের। সে পড়ত সেইন্ট জেভিয়ার্স-এ আর আমি পড়তুম বেথুনে। তার বাবার সঙ্গে তোর পিসেমশায়ের বাবার ভাল জানাশোনা ছেল। খুব নাম করা দাঁতের ডাক্তার ছিলেন যে।

—কে?

—কে আবার? জ্যোতির বাবা। কেউই জানে না, আমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। আলাপও হয়েছেল ওদের বালিগঞ্জের বাড়িতে।

বলেই, বড় পিসিমা টিক করে একবার হাসবেন। গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ছেল। কিন্তু হাসলে বড় মিষ্টি দেখাত।

—তা বিয়েটা হল না কেন পিসি? হলে, আমাদের স্ট্যাটাস....

আরে তোর দাদু, মানে আমার বাবাই তো কেঁচিয়ে দিলেন। বললেন, ছোঁড়া কম্যুনিস্ট। তার ওপরে ওরা তো বাঙাল। বাঙালের সঙ্গে

হাটখোলার দত্তের মেয়ের বিয়ে কি হয় নাকি? তা ছাড়া, বয়সও তো সমান সমান। সে যুগে স্বামীর বয়স স্ত্রীর বয়সের চেয়ে কমপক্ষে দশ-পনেরো বছর বেশি হত। তবে স্ট্যাটাসের কথা বলিসনি। জ্যোতিকে কে জানত? তখন বিয়ে হলে তার স্ট্যাটাসের পালেই হাওয়া লাগত। আমাদের নিজেদের স্ট্যাটাস কি কম চেল তকন?

ডাহুক বলল, এখন তো স্ত্রী বয়স স্বামীর বয়সের চেয়েও বেশি হচ্ছে। তিন-চার বছর তো আকছার বেশি হচ্ছে।

—নারায়ণ। নারায়ণ! এবারে মানে মানে যেতে পারলে হয়।

—এখুনি যাবে কি? জ্যোতিবাবুর মতো তুমিও সেঞ্চুরি করবে। তোমার চুরানব্বই বছরের জন্মদিনে ক্যালকাটা ক্লাব-এ ক্রিস্টাল রুম বুক করে পার্টি দেব। সবাইকে ডাকব। তোমাদের পাড়ার সবাইকেও। তোমার ডাক্তার এবং কাজের সব লোকজনকেও। চিফ-মিনিস্টার তুমি নাইবা হলে বড় পিসি। আমাদের সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তো তুমি বটেই।

—রাখ দিকি। যত্ত সব বাজে কতা। গত দুবছরে বাড়ি ছেড়ে কোথাওই বেরুইনি। একেবারে কাশী মিত্তিরের ঘাটে যাব। আর কোথাওই যাবার নেই আমার।

—পিসি, অমন অলুক্ষণে কথা বলবে না সন্ধেবেলা। এবারে রাখছি শনিবার তোমাকে দেখতে যাব।

—খাবি কী?

—লুচি আর মোহনভোগ।

—নোন্তা কিছু?

—কুমড়ো আর ছোলার তরকারি শুকনো লংকা দেওয়া।

—ঠিক আছে। নকুড় থেকে কড়াপাকের সন্দেশও আনিয়ে রাখবখন। আসিস।

—যাব।

চা খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সকাল বিকেলের চাটা ও একই সময়ে খায়। আজ অনেকেই দেরি হয়ে গেল।

—জগদীশ এসে বলল, চা দিই বাবু।

—দাও।

—দুপুরে কী রাঁধব?

—যা ভাল মনে করো রাঁধো। আমাকে বিরক্ত কোরো না।

—কটাতে খাবেন?

চট করে দেওয়ালের গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, দুটোতে দিও।

—ঠি আছে।

ডাহুক লক্ষ্য করল যে জগদীশ বংশীবদনেরই মতো 'ঠি' আছে বলছে। তার কাছেও সময় খুবই দামি হয়ে গেছে।

জগদীশ চা দিয়ে চলে গেল। একটু চিজ-স্ট্র দিয়ে কাপে চা ঢেলে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে। কুমুদিনীকে ফোন করল। একটা মিসড কল ছিল। এনগেজড। তারপরে ফোন রেখে মনোযোগ দিয়ে চা খেতে লাগল।

জগদীশ ঘরে এলে বলল, পুলিন এনেছে? চিজ স্ট্র?

—আঁজ্ঞে বাবু। দুপুরে তা হলে তেল কই-ই করছি, কালোজিরে কাঁচালঙ্কা দিয়ে।

—করো, তবে সাদা তেল-এ করবে না, সর্ষের তেল-এ করবে। আর লাল সর্ষে দিয়ে করবে। বুঝেছো?

—বুঝেছি। গত সপ্তাহেও ও তাই-ই করেছিলাম।

—বেশ। আর পুলিনকে জিগগেস কোরো তো কোথা থেকে এসেছে চিজ-স্টু? ন্যু মার্কেটের নাহুম অথবা ফ্লুরী'জ থেকে কিছুদিন না এনে যেন তাজ বেঙ্গলের বেকারি থেকে আনে।

—আপনি ক্যালকাটা ক্লাব-এর বেকারি থেকে আনতে বলেছিলেন তো মাঝে, শান্তিনিকেতনে যাবার আগে।

—তা বলেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন তাজ থেকেই আনুক।

—বেশ।

আবার কুমুদিনীর নাম্বারটা চেষ্টা করতেই লেগে গেল। কুমুদিনী ধরল।

—তুমি কোথায়?

—বাগানে।

—কী করছ?

—স্থলপদ্মর গাছগুলো দেখছি।

—আমারও স্তনপদ্মর গাছটিকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।

—আবারও অসভ্যতা। আপনার সঙ্গে আমি কথা বলব না।

—অপরাধ?

—আমি ঘুমিয়ে রইলাম আপনার বিছানাতে আর আপনি আমাকে না বলে ভোরের ট্রেনে বিশ্বভারতীতে কলকাতা চলে এলেন সাতসকালে। এটা কি ভাল হল?

—তোমার কাছ থেকে পালিয়ে এলাম। যা পাগলামি করছিলে।

—আমার কাছ থেকে কোথায় পালাবেন আপনি? বিশ্ববিখ্যাত বক্সার জো লুই একবার বলেছিলেম না?

—কী বলেছিলেন?

—উ্য মে রান, বাট উ ক্যানট হাইড।

—তাই?

—ইয়েস। বলেই বলল, শুনুন। আমি আজই শান্তিনিকেতন এক্সেপ্রেস এ কলকাতাতে যাচ্ছি। স্টেশন থেকে সোজা আপনার বাড়িতে পৌঁছব। ঠিকানা আর ডাইরেকশনটা দেবেন একবার। দয়া করে বাড়িতে থাকবেন। কথা আছে। আর কাল আমাকে উপোসী রেখেছিলেন। আজ খাব। রাতে।

—বিকেলে চা তো খাবে। রাতে কী খাবে? চা এর-এর সঙ্গে কী খাবে? মাছের চপ করতে বলব? তেলেভাজা খাবে? মুড়ি দিয়ে?

—খাদ্যদ্রব্য যা দেবেন তাই খাব। পানীয়ও। কিন্তু আপনাকেও খাব। চাকুম-চুকুম করে। সেটাই হবে মেইন-ডিশ। আর আমি যখন থাকব তখন

আর কেউই যেন না আসে।

—বেশ।

—'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না। এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো, কেউ জানবে না, কেউ বলবে না। বিশ্বে তোমার লুকোচুরি দেশ-বিদেশে কতই ঘুরি—এবার বলো আমার মনের কোণে ছলবে না।'

—বুঝেছেন মশাই।

—হুঁ বুঝলাম।

তারপরে বললাম, পুঁচকির কোনো খবর পেলে?

—না।

—জানতাম, পাবে না।

—মানে?

—মানে নেই। এমনিই বললাম।

—তুমি কী পরে আছ?

—ম্যাক্সি। আমাদের বাগানে কম্পাউন্ড ওয়াল আছে। গেট-এও ছ্যাঁচাবাঁশ-এর বেড়া আছে। বাইরে থেকে দেখা যায় না।

—পথচলতি লোক না হয় তোমাকে একটু দেখতই। তুমি এতো কৃপণ কেন?

—যাদের অনেক থাকে তারাই কৃপণ হয়।

—কেন?

—নিঃস্ব হওয়ার ভয় তাদের সব সময়েই তাড়া করে বেড়ায় যে।

—ও।

—তোমার মা কেমন আছেন?

—ঐরকমই, ইতর-বিশেষ নেই কোনও। পাপস্খালন করছেন ধীরে ধীরে। যেমন করে স্যালাইন বোতল থেকে স্যালাইন ঢোকে শরীরে। পাপও একবার জমে গেলে তা তোড়ে বেরোয় না, ফোঁটা ফোঁটা বেরোয়, ড্রিপের মতো। পাপস্খালন কি অত সোজা?

—তা ঠিক।

—আপনার কত পাপ জমেছে?

—নিজের পাপের পরিমাণ কি মানুষ বুঝতে পারে?

—পারে না?

—না।

ঠিক আছে। যাওয়ার সময়ে গৌরহরির দোকান থেকে আপনার জন্যে পাঁঠার মাংস নিয়ে যাব।

—বেশি এনো না।

—এই কেজি দুয়েক।

—অত দিয়ে কী হবে। অত পাঁঠার মাংস খাওয়ার মানুষ নেই আমার বাড়িতে। বুদ্ধিমানের মাংস হলেও না হয় কথা ছিল। খাবো তো আমি আর তুমি আর জগা। আর তার জনা দুই সৈন্য। ওর আবার হাই-কোলেস্টেরল আর ব্লাড প্রেসার। কী করে যে হলো, কে জানে।

—আপনার কাছে এতদিন কাজ করছে। আগে যে হয়নি এই তো ঢের। আচ্ছা, এবারে আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

—তোমার ড্রাইভার কি ফিরে এসেছে? তুমি তো গাড়ি নিয়ে গেছিলে।

—না ফেরেনি। ফিরবেও না। তার শালীদের ডিউটি শেষ হবে রাতে। তাকে মোবাইল-এ বলে দিয়েছি সে কাল সকালে ওখান থেকে সোজা চলে যাবে কলকাতাতে।

—তাহলে তো স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে হবে।

—না পাঠালেও হয়, ট্যাক্সি করে চলে যাব। ঠিকানা আর ডাইরেকশনটা দেবেন।

—তা কী হয়। তুমি আমার এত আদরের ধন, কুসুমরতন, কুমুদিনী বলে কথা। গাড়ি অবশ্যই পাঠিয়ে দেব। ড্রাইভারের নাম পুলিন।

—কিন্তু ড্রাইভার তো চিনবে না আমায়।

—চিনবে। বলে দেব, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস থেকে সবচেয়ে সুন্দরী

যুবতী যিনি নামবেন, তিনিই তুমি।

—বাজে কথা বলবেন না। ওকে আমার নাম লেখা একটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে বলবেন। পুরো নাম লিখেবেন না, শুধু লিখবেন 'K'

—যদি 'কে?' লিখি?

—যা খুশি লিখুন। আমি বুঝতে পারলেই হবে। কোন গাড়ি পাঠাবেন? আপনার তো অনেক গাড়ি।

—টয়োটা করোলা পাঠাব। সাদা রঙা।

—ঠিক আছে। কটা গাড়ি আপনার?

—চারটে।

—অতগুলো গাড়ি দিয়ে কী করেন?

—শচীন তেণ্ডুলকর অতগুলো ব্যাট দিয়ে কী করে? বড় বড় শিকারিরা অতগুলো রাইফেল বন্দুক দিয়ে কী করতেন? যার যা সখ। তুমি অতগুলো শাড়ি বা জিনস দিয়ে কী করো?

—আপনার সঙ্গে কথায় পারব না। আপনার নাকি একটি ছাই রঙা মার্সিডিজও আছে। কী করেন এতগুলো গাড়ি দিয়ে? শো অফ ওয়েলথ?

—সে তুমি বুঝবে না।

—কেন? না বোঝার কী আছে?

—ইটস অ্যান এক্সপ্রেশন অফ হেট্রেড। চারদিকে এত ঈর্ষাকাতর মানুষের ভিড়। তাদের ঈর্ষার পারদ আরও চড়াবার জন্যেই এসব করি। সত্যি বলছি। বিশ্বাস করো। এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই।

—আশ্চর্য মানুষ আপনি।

—সে কথা ঠিক। আমি অসাধারণও। আমি আমারই মতো। অন্য কারও মতোই হতে চাই না, চাইন কোনওদিনও। অন্য কারো মতো হলে কি তোমার ভাল লাগত আমাকে?

—না।

কুমুদিনী তার পর বলল, ঠিক আছে। এবারে চানে যাব।

—তোমার চানঘরে টিকটিকি আছে?

—নাঃ। আপনার এইসব রসিকতা ক্লিশে হয়ে যাচ্ছে সূর্যাস্তর ফোটোগ্রাফের মতো।

সবকিছুই। সংসারের, শরীরের, সুন্দরের, সুন্দরতম জিনিসও একদিন ক্লিশে হয়ে যায়। একটু উষ্ণতার জন্যের টাইটেল পেজ-এ এক ইংরেজ কবির কবিতার উদ্ধৃতি আছে না?

"সুইট হার্ট ডু নট লাভ টু লঙ
আই হ্যাড লাভভ লঙ অ্যান্ড লঙ
অ্যান্ড গ্রু আউট অফ ফ্যাশন,
লাইক অ্যান ওল্ড সং।"

আমি ত নিজেই ক্লিশে হয়ে গেছি, আমার চাওয়া যে ক্লিশে হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে।





১৩

ট্রেনটা সম্ভবত দেরি করছে। গ্রান্ড ফাদার ক্লকটির দিকে একবার চেয়ে দেখল ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে ডাহুক। হাওড়াতে পৌছলে এতক্ষণ কুমুদিনীর এসে যাওয়ার কথা ছিল।

এমন সময়ে এয়ারকন্ডিশনড ঘরের থেকে দরজার কলিং বেল-এর চাপা শব্দ পেল। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়াল। কুমুদিনী একটি পলাশরাঙা শাড়ি পরেছে, একটি কালো ব্লাউজ, কপালে একটি টিপ, পলাশরাঙা। ওর মধ্যে এমন একটা নিষ্পাপ আদুরে আদুরে ভাব আছে যে, মনে হয় যেন বেড়ালনি। দেখলেই কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। প্রথম যেদিন দেখে, সেদিনও অমনই ইচ্ছে করে ছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মুখটা তুলে কুমদিনী হাসিমুখে বলল, আমি এসেছি।

ডাহুক কিছু বলল না, আক্ষরিকভাবে দুটি হাত বাড়িয়ে দিল কুমুদিনীর দিকে। তারপর সে উঠে এলে তাকে দু হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দুয়ার দিল।

—বাঃ। কী সুন্দর আপনার ঘরটি। কখনও আসিনি তো আগে।

—ঘরে আসোনি কিন্তু মনে তো এসেছো।

—তা এসেছি। বাঃ, এই ফুলদানিটা কোথাকার?

—জার্মানির। রোজেনথালের।

—দারুণ তো রঙটা। ম্যাজেন্টা আর গাঢ় বটল গ্রিন। সবুজে মেশা। ফুলগুলিও খুব সুন্দর। আপনি সাজিয়েছেন?

—আমার সময় কোথায় বলো? সাজিয়েছে, যে তোমাকে দরজা থেকে এসকর্ট করে নিয়ে এল সে।

—কী নাম তার?

—জগদীশ।

—জয় জগদীশ হরে।

—তাই। এখানে জগদীশ আর শান্তিনিকেতনে বংশীবদন এরাই আমার গার্জেন।

—আমাকে একটা চাকরি দিন না।

—চাকরি দেব না, ভাবছি আমার সব কিছুরই মালকিন করে দেব তোমাকে। সেই কবে থেকে বসে আছি সে অপেক্ষাতে।

—তাই?

—তাই।

—ট্রেন থেকে নেমে সোজা যে চলে এলে? স্বামী আর পুঁচকির খবর করলে না?

—এলাম, কারণ অনেক জরুরি কথা আছে, আপনার সঙ্গে। সেই কথাগুলো বলতে আর দেরি করা যাবে না। অনেকই দেরি হয়ে গেছে।

—বলবে বলবে, আগে চা-টা খেয়ে নাও। বলেই রিমোট কন্ট্রোলে কলিং বেল এর সুইচ টিপল।

জগদীশ এলে বলল, চা কী দিয়ে দেবে মেমসাহেবকে?

—যা করেছি, নিয়ে আসছি।

—চা, না কফি।

—চা খাব। তবে লিফ-টি।

—আমি লিফটি-ই খাই, লপচু, চলবে তো?

—আমি খাই মকাইবাড়ি—সেও তো দার্জিলিং এরই। চলবে ।

—চা কি বেশি দেবে না কম দেবে?

—কম দেবে।

—বেশিক্ষণ ভেজাবে, না অল্পক্ষণ।

—অল্পক্ষণ।

—শুনলে ত সব জগদীশচন্দ্র?

—হ্যাঁ বাবু, শুনেছি।

—এবারে যাও সব নিয়ে এসো।

একটু পরেই জগদীশ একটি কাঠের ট্রের উপরে হালকা হলুদ ট্রে-কভার এবং তার উপরে ছিপছিপে লালচে রঙা একটি ফুলদানিতে একটি মাত্র সাদা চন্দ্রমল্লিকা গুঁজে নানারকম খাবার নিয়ে এল।

কুমুদিনী বলল, এই ফুলদানিও কি রোজেনথাল-এর? জার্মানির?

—না। এটি ওয়েজউডের। ইংলিশ।

—বাঃ।

জগদীশ বলল, আমি চা নিয় আসছি দশ মিনিট বাদে।

—সব বাড়িতে বানানো। শুধু পেস্ট্রিগুলো ফ্লুরিজ-এর।

মনে হল কুমুদিনীর খিদে পেয়েছিল। খুব তৃপ্তি করে খেলো। তার পর জগদীশ চা নিয়ে এলে ড্রাগন আঁকা জাপানিজ কাপে চা খেয়ে ফিঙ্গার বাওলে হাত দিয়ে কাপড়ের ন্যাপকিনে হাত মুখ মুছে নিল।

জগদীশ চলে গেলে বলল, আমরা কি এখানে বসেই কথা বলব?

ডাহুক একটু হেসে বলল, না চলো, শোবার ঘরেই চলো।

—দরজাটা লক করবেন না?

—না। কোনও দরকার নেই। জগদীশ আছে। আরও দুজন আছে ওর চেলা। তারাই পাহারা দেবে।

—আমার ব্যাগটা রইল। আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি। ব্যাগটি আপনি পাহারা দেবেন কিন্তু।

—আর আমার লোভকে কে পাহারা দেবে?

ব্যথরুম থেকে বেরিয়ে কোনও ঘটনার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে

নার্ভাস গলাতে কুমুদিনী বলল, কেউ চলে এলে?

—কেউই আসবে না। উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমার কাছে কেউই আসে না। আমাকে মোবাইলে ফোন করবে জগদীশ। আমি অনুমতি দিলেই আসতে দেবে। তা ছাড়া উপরে তো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছাড়া কেউই আসে না, নিচের বসবার ঘরেই বসে।

—আমি বুঝি আপনার খুব ঘনিষ্ঠ?

—ছিলে না। ছিলে, তাবে কল্পনাতে। এখন বাস্তবে হয়েছ।

বেডরুমে মস্ত বড় খাট। হালকা নীল সিল্কের বেডশিট পাতা। পাশে একটি সোফা। ছোট একফালি গাঢ় নীল রঙা মিশরীয় গালচে পাতা, সাদা মার্বল-এর মেঝের উপরে।

—এর বড় খাট দিয়ে কী করেন? আপনি তো দোকা নন?

—হতে তো পারি কোনোদিন। দোকা শোয়ার মহড়া দিই। কল্পনাতে।

সোফাতে বসে, কুমুদিনী বলল, অনেক অবান্তর কথা হল। এবারে কাজের কথা বলি। আমার জীবন-মরণের কথা।

—পুঁচকি ও স্বামীর কোনো হদিশ পেলে?

—বলব।

—তার আগে তুমি ওই কাগজে যেসব প্রশ্ন কথা আছে তার জবাবগুলো আমাকে দিয়ে নাও। তার পরে তোমার কথা শুনব।

—কী কাগজ? দেখি।

—ওর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি বাজারের ফর্দর মতো কাগজ বের করে দিল ডাহুক।

বলল, প্রশ্নগুলো একে একে, জোরে পড়। তার পরে জবাব দাও।

কুমুদিনীকে বেশ নার্ভাস লাগছিল। কাগজটি হতে দিয়ে তাতে চোখ বুলিয়ে অনেকক্ষণ মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকল। তারপর অবিশ্বাসের চোখে চাইল ডাহুকের মুখে।

—কী হল? পড়।

কুমুদিনী তুতলে পড়ল—

[১] আমার সঙ্গে এতদিন ধরে মিথ্যাচার করে এলে কেন?

—উত্তরগুলো পরে দিও একই সঙ্গে। প্রশ্নগুলো পড়ে নাও।

[২] তোমার স্বামী, যার নাম তুমি দিয়েছ "স্বামী", একটি কল্পিত চরিত্র কি না?

[৩] তোমার বিয়েই যখন হয়নি তখন পুঁচকিও একটি কল্পিত চরিত্র। হ্যাঁ কি না?

[৪] শান্তিনিকেতনে তোমাদের কোনো বাড়ি নেই। গুরুপল্লীতে তোমার বন্ধু নমিতার ফাঁকা বাড়িতেই তুমি ওঠো, যখন সেখানে যাও। আমার সঙ্গে আলাপের পরে মাত্র তিনবার গেছ শান্তিনিকেতনে। বসন্তোৎসবে এবং পৌষোৎসবে। তবে তুমি শান্তিনিকেতনেরই স্নাতক—পড়াশোনার সময় হস্টেলেই থাকতে। এবারে তুমি রতন-কুঠিতে উঠেছিলে।

[৫] তোমার বাবা এবং মা কেউই বেঁচে নেই। তুমি গলফ-গ্রিনে থাকো তোমার কোম্পানির ফ্ল্যাটে। কলকাতায় তোমার আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই। তোমার শিকড় নাগপুরে। ছোটা ধানতলিতে তোমাদের বাড়ি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের আগের চিফ-জাস্টিল বিকাশ শ্রীধর সিরপুরকার সাহেবের বাড়ির কাছে। তোমার বাবা নাগপুরের একজন নামী বাঙালি ছিলেন। তাই তো?

ইংরেজিতে যাকে বলে 'ক্রেস্টফলেন' তাই হয়ে গেল কুমুদিনী কাগজটি পুরো পড়ে। ওর মুখটা প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তারপরে জলপদ্মর মতো। পরক্ষণেই সে ডাহুকের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোট ছোট মেয়েলি মুঠি দিয়ে ডাহুকের বুকে বার বার আঘাত করতে লাগল আর মুখে বলতে লাগল, আপনি খারাপ। খারাপ! খারাপ!

ডাহুক তাকে দুহাতে জড়িয়ে বুকে নিল। তার পর হাসতে হাসতে বলল, পৃথিবীর ইতিহাসে তোমার মতো একজনও বোধহয় এত ছলনার আশ্রয় নেয়নি কারোকে পেতে চেয়ে। আমি যখন প্রথম দিন থেকেই তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি তখন তোমার এমন করার কোনোই কারণ ছিল বলে মনে হয় না। তোমার আত্মবিশ্বাস এত কম কেন? আগে কেউ কি তোমাকে আঘাত দিয়েছিল?

কুমুদিনীর দু চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল তখন। আনন্দাশ্রু। সে ডাহুককে

শক্ত হাতে জড়িয়ে রইল। মনে হল, সেই বাঁধন সে আর শিথিল করবে না কোনোদিনও।

অনেকক্ষণ পরে ধরা গলাতে বলল, বড় ভয় ছিল, পাছে আপনাকে না পাই।

জোরে হেসে উঠল ডাহুক, বলল, তুমি যেভাবে কেসটাকে কমপ্লিকেটেড করেছিল তাতে সব ভণ্ডুলও হয়ে যেতে পারত।

কুমুদিনী যেন কী বলতে যাচ্ছিল, ডাহুক নিজের দুটি ঠোঁট দিয়ে তার দুটি ঠোঁটকে বন্ধ করে দিল।

কুমুদিনী তখনও নীরবে কাঁদছিল।

একটু পরে ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল, আমার বড় পিসিমাকে একটা ফোন করতে হবে।

মোবাইলে চট করে পেয়েও গেল।

—পিসি, তুমি এখন কী করছ?

—উত্তমকুমারের একটি ছবি দেখছি। চোখে তো দেখি না কিন্তু উত্তমকুমারকে ঠিক দেখতে পাই। আহা। চাঁদমুখো আর কাকে বলে।

—শোনো পিসিমা, আমি তোমার বউমাকে নিয়ে তোমার কাছে পৌঁছচ্ছি। এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। আর তোমার জন্যে ব্ল্যাক ডগ হুইস্কিও নিয়ে যাব।

কুমুদিনী চোখ বড় বড় করে বলল, আপনার পিসিমা হুইস্কি খান?

—তুমি খেতে পারো, পিসিমা খেতে পারেন না?

লজ্জিত হয়ে কুমুদিনী বলল, আমার অন্যায় হয়েছে।

—পিসিমার বয়স কত?

—মাত্র চুরানব্বই। যখন তখন কিছু হয়ে যেতে পারে। তবে এমনিতে ঠিকই আছেন। এখনও হাঁটাতে চলতে পারেন। জরাগ্রস্ত হননি। জ্যোতিবাবুর সমবয়সী, তাঁর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধও নাকি এসেছিল। পিসিমার আশীর্বাদটা নিয়ে নেওয়া জরুরি। তারপর ওখান থেকে তোমার ফ্ল্যাটে যাওয়া যাবে। ওখান থেকেই নাগপুরে ফোন কোরো। সেখানে তোমার জ্যাঠামশাই জ্যেঠিমা আছেন তো, তাই না? আর হিউস্টনে কাকা-কাকিমাকেও ফোন

করতে হবে। না কি?

—আপনি কি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন?

—হাঁ যা দিনকাল পড়েছে। আনজান কোনো মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাতে প্রচুর বিপদ আছে। তাঁরা তোমাকে ক্লিন সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তবে এও বলেছেন যে তুমি একটু পাগলি আছো। তবে আমার হিসেবি মেয়ের চেয়ে পাগলি মেয়েই ভাল লাগে।

—আপনিও তো পাগল কম নন।

—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, যাকে ভালবাসে, তাকে মেয়েরা পাগল বলে।

—তাই?

—চলো, আমরা বেরিয়েই পড়ি।

—যদিও শোবার ঘরে রয়েছি আমরা কিন্তু তুমি তো বেনারসী পরে নেই, ঘরে ফুলে নেই, তোমার গলাতে মালা নেই, বিছানাতে ফুল নেই, আতর নেই, তাই আমাদের আদরটাও তোলা থাক সেদিনের জন্যে। কী বলো?

কুমুদিনী যে শান্তিনিকেতনে ডাহুককে রেপ করতে এসেছিল সে একেবারে ভালবাসায় জরজর একটি নরম হলুদ বসন্ত পাখির মতো মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল ডাহুকের বাঁ হাতটি শক্ত করে ধরে।

ডাহুক মোবাইলে জগদীশকে বলল, পুলিনকে বলো, মার্সিডিজ গাড়িটা বের করে গেট-এ লাগাতে। টোয়োটা গারাজ করে দিতে বলো।

তার পর কুমুদিনীর কপালে একটি ছোট্ট আলতো চুমু খেয়ে বলল, চলো, বড় পিসিমাকে প্রণাম করতে যাই।